ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি

প্রথম খণ্ড

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী

التفرقة وأصول الأئمة المتبوعين

ফিরকাবন্দী

বনাম

অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি

প্রণয়নে
আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী

تم طبع هذا الكتاب بمناسبة الاجتماع للمجلس العمومي
لـ جمعية أهل الحديث بنغلاديش
في العاصمة دكا في عام ١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١١م

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের
পক্ষে– প্রফেসর একেএম শামসুল আলম
৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৯৫৬৬৭০৫

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৬

হরফ বিন্যাস
এস.আর কম্পিউটার্স
৬ তাঁতখানালেন
ফোন ঃ ০১৭১৫-৫৭৯২০১

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা

মুদ্রণে
এ.এম.বারীর পক্ষে
এ. কে. এম শামসুল আলম কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নিবেদন

এই গ্রন্থ মারহূম হযরত আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শীর দীর্ঘ সাধনা ও গভীর গবেষণার অমৃত ফল। গ্রন্থের সূচীপত্র এবং প্রমাণপঞ্জী দৃষ্টেই উহা অনুমান করা যাইতে পারে। মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে যখন উহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে তখনই উহার প্রতি বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য দাবী উত্থিত হয়। নানা কারণে এতদিন উক্ত দাবী পূরণ করা সম্ভবপর হয় নাই। তওফীকে -ইলাহী সহায় হওয়ায় এক্ষণে উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হইল। এজন্য আল্লাহর বারগাহে আমাদের লাখো শোকরিয়া। প্রভু হে ! ইহার সওয়াব আল্লামা মারহূমকে এনায়েত করুন !

লেখক ইমামকুল গৌরব আহমদ বিনে হাম্বলের জীবনকথা ও আদের্শের আলোচনা কেবল শুরু করিয়াছিলেন শেষ করিতে পারেন নাই। এই জন্য উহা এই খণ্ডে সন্নিবেশিত করিতে না পারায় বাঞ্ছিত আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। আল্লাহর মর্যী হইলে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার আকীদা, মসলক, নীতি ও সমস্যার সমাধান পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

দুঃখের বিষয় ছাপার ভুল ছাড়াও এই সংস্করণে নানারূপ ত্রুটি ঘটিয়া গিয়াছে। এজন্য আমরা দুঃখিত এবং পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থী। ইনশা আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন ছাড়াও উত্তম কাগজ, সুন্দরতর মুদ্রণ এবং শোভনীয় প্রচ্ছদের ব্যবস্থা করার প্রয়াস পাইব।

আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড
পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা

মুহাম্মদ আবদুর রহমান
৩০ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ইং।

দ্বিতীয় সংস্কারণের নিবেদন

"ফিরকাবন্দী ..." এর প্রথম সংস্করণের সমুদয় কপি বহু পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছে। বিভিন্ন মহল হইতে বহু চাহিদা এবং পৌনঃপুনিক তাকীদ সত্ত্বেও নানা কারণে এ যাবৎ উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। একমাত্র আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এক্ষণে উহা আগ্রহী পাঠক সমাজের নিকট পেশ করা সম্ভব হইল। এজন্য আমরা তাঁহারই বারগাহে জানাই আমাদের হৃদয়ের অকপট শুকরিয়া।

মুহাম্মদ আবদুর রহমান
জেনারেল সেক্রেটারী,
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।
মার্চ, ১৯৮৬ ইং।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ। নাহমাদুহু-অ-নুসাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম।

আম্মা বা'দ।

'ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি' বইটি জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রহ) এর অমর কীর্তি। এ বইয়ে লেখকের জ্ঞানের গভীরতা, আকীদার স্বচ্ছতা এবং আরবী, বাংলা, উর্দু, ইংরেজী ও ফার্সী ভাষায় তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় মিলে। লেখকের বিভিন্ন প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে তিনি আহলে হাদীসের ইতিহাস লিখেছেন, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০০। সেই ইতিহাস বইয়ের পান্ডুলিপি এখনও বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। তবে এ বইটিতে সেই ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায় স্থান পেয়েছে নিঃসন্দেহে। তাই বইটিতে অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী পাঠকবর্গের মনের খোরাক রয়েছে। তাছাড়া মুসলিম মিল্লাতের বিভিন্ন দল-উপদল এবং বাতিল পন্থীদের ভ্রান্তধারনার বিশদ বিবরণ রয়েছে এই অমূল্য গ্রন্থে। বইটির শেষাংশে তিনজন বিখ্যাত ইমামের জীবনী সন্নিবেশিত হওয়ায় এর গুরুত্ব আরো বেড়েছে।

মরহুম মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী (প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, জামেয়া লালবাগ) এই বই থেকে ইমাম আ'যম আবু হানিফার জীবনী পড়ে মন্তব্য করেছিলেন- "হানাফী ঘরে জন্মগ্রহণ করে এবং সারা জীবন ইমাম আবু হানিফার অনুসারী থেকেও মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফীর লেখা ইমাম সাহেবের জীবনের অনেক মূল্যবান অধ্যায় জেনেছি।" বস্তুতঃ মরহুম কুরায়শী সাহেব মাযহাবী ইমামদের জীবনী লিখেছেন দরদভরা মন নিয়ে। তাই বইটি সব মহলেই সমভাবে সমাদৃত।

বইটির বর্তমান সংস্করণের মৌজুদ শেষ হয়েছে এবং পাঠক বর্গের চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন সংস্করণ বের হচ্ছে এ জন্য দয়ালু আল্লাহর দরবারে জানাই লাখে সিজদায়ে শোকর। এ কাজে যারা আর্থিক ও সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, তাদের ইহ-পরকালীন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। আল্লাহ যেন সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময়ে পুরস্কৃত করেন।

ফিরকা সমূহের উত্থান ও এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানার জন্য বইটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে এ বিশ্বাস ব্যক্ত করে বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

আল্লাহ-ই উত্তম তাওফীক দাতা। তাঁর দরবারে-ই সার্বিক মদদ চাই। 'হুয়াল মুসতা'আন'।

ঢাকা
১২ মে, ২০০৬ ইং

এ.কে.এম. শামসুল আলম
সভাপতি
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শীর
সংক্ষিপ্ত জীবনী

আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শীর জন্ম পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার টুব্বগ্রামে ১৯০০ সালে। তাঁর পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ছিল চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আব্দুল হাদী, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম যথাক্রমে সৈয়দ রাহাত আলী এবং সৈয়দ বাকের আলী। এঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্যের তুস নগরীর অধিবাসী। মাতার নাম উম্মু সালমা। তিনি পিতার নিকট ফারসী ও আরবীতে প্রারম্ভিক শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আল্লামা আব্দুল্লাহেল বাকীর নিকট পারিবারিক মাদরাসায় আরবী ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি কোলকাতা আলিয়া মাদরাসায় এংলো-পারসিয়ান বিভাগ হতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেন্ট জেভিয়ারস কলেজে বি.এ. ক্লাসে অধ্যয়ন কালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা বর্জন করে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১৯২১ খৃ. তিনি মাওলানা আকরাম খাঁর উর্দু দৈনিক 'যামানা'র সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন এবং খন্ডকালীন সম্পাদকেরও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২২ খৃ. মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী "জাম'ইয়াতু 'উলামা-ই বাঙ্গালা" প্রতিষ্ঠানের সহ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে নিজ সম্পাদনায় তিনি সাপ্তাহিক "সত্যাগ্রহী" প্রকাশ করেন। ১৯২৬ খৃ. শহীদ সহরাওয়ার্দীর সহকারীরূপে মাওলানা কাফী Independent Muslim Party-র সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন ও উহার সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। একই সাথে তাঁর তাবলীগ বা ইসলাম প্রচারের তৎপরতা চলতে থাকে। সারা বাংলায় বহু জলসায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি কুরআন ও সুন্নাহর বাণী প্রচার এবং শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। কংগ্রেস পরিচালিত আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে তিনি ১৯৩১-৩২ খৃ. রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক ভাষণ দানের অভিযোগে দু'বার কারাদন্ড ভোগ করেন। অতঃপর মাওলানা কাফী সক্রিয় রাজনীতি হতে দূরে থেকে আমৃত্যু একনিষ্ঠভাবে আহলে হাদীস জামাআতের সংগঠন উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৯ খৃ. তাঁরই উদ্যোগে বগুড়া জেলা আহলে হাদীস কনফারেন্স, ১৯৩৫ খৃ. রংপুরের হারাগাছ বন্দরে উত্তরবঙ্গ আহলে হাদীস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ খৃ. তাঁর সভাপতিত্বে পাবনা জেলা আহলে হাদীস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৬ সালে হারাগাছ বন্দরে নিখিল বঙ্গ ও আসাম-আহলে হাদীস কনফারেন্সে গঠিত "নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস" এর সভাপতি নির্বাচিত হন মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী। জমঈয়তের দফতর স্থাপিত হয় কোলকাতার মিসরীগঞ্জে।

১৯৪৮ খৃ. পাবনা শহরে দফতর স্থানান্তরিত হলে সংগঠনের নাম হয় "পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস"। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ খৃ. জমঈয়তের নিজস্ব "আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ" নামে একটি মুদ্রণালয় ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং একই সালে জমঈয়তের মুখপত্ররূপে তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় মাসিক "তর্জুমানুল হাদীস" আত্মপ্রকাশ করে। মাওলানার নেতৃত্বে তদানীন্তন পাকিস্তানে প্রকৃত ইসলামী শাসন প্রবর্তনের আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। ১৯৫৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় কনফারেন্সে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। একই সালে একই উদ্দেশ্যে তাঁরই উদ্যোগে পাবনায় প্রদেশের বিভিন্ন ইসলামী দলের সমবায়ে "ইসলামী ফ্রন্ট" কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ এর শেষের দিকে জমঈয়তের দফতর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৭ খৃ. ৭ অক্টোবর তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "আরাফাত" আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৮ সালে তাঁরই উদ্যোগে ঢাকাস্থ নাজির বাজারে "মাদরাসাতুল হাদীস" প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামী বিষয়ে তাঁর রচিত (প্রকাশিত-অপ্রকাশিত) বিভিন্ন ভাষায় অর্ধ শতাধিক পুস্তক পুস্তিকা রয়েছে। তাঁর জীবনব্যাপী ইসলামী সাহিত্য সাধনা ও গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬০ খৃ. বাংলা একাডেমী তাঁকে সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত করেন। দেশ ও মিল্লাতের খিদমতে উৎসর্গিত প্রাণ চিরকুমার আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী ১৯৬০ সালে ৪ জুন এই মরজগত হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেঊন। দিনাজপুরস্থ নূরুল হুদা গ্রামে পিতামাতা ও ভ্রাতার পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি

ফিরকাবন্দীর উত্থান

কুরআন ও হাদীসের ব্যবহারিক পতনের পটভূমিকায় পৃথিবীতে ফিরকাবন্দী বা দলীয় মযহবসমূহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী তদীয় 'ইযালাতুল খফা' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, "বনি উমাইয়া শাসনের অবসান কাল অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১৫০ হিজরী পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজেকে হানাফী, শাফেয়ী বলিতেন না বরং স্ব স্ব গুরুগণের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করিতেন। আব্বাসীয়দের শাসনকালে সর্বপ্রথম প্রত্যেকেই নিজের জন্য পৃথক পৃথক দলীয় নাম নির্ধারিত করিয়া লইলেন এবং আপন গুরুগণের নির্দেশ খুঁজিয়া বাহির না করা পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন। ইতিপূর্বে শুধু ব্যাখ্যার বিভিন্নতা লইয়া যে মতভেদের সূত্রপাত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা দৃঢ়তর হইল। আরব রাজত্বের অবসান অর্থাৎ ৬৫৬ হিজরীর পর মুসলমানগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহারা স্ব স্ব মযহবের যতটুকু অংশ স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিলেন শুধু সেইটুকুকেই ব্যবহারিক শাস্ত্রের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া লইলেন। ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তীগণের নিছক উক্তির উপর পরিকল্পিত হইয়াছিল অতঃপর সেগুলি বিশুদ্ধ সুন্নতরূপে পরিগৃহীত হইল। ইহাদের বিদ্যা অনুমানের উপর গঠিত এবং এক অনুমান পরবর্তী আর একটি অনুমানের উপর পরিকল্পিত; ইহাদের রাজত্ব অগ্নিপূজকদের ন্যায়। তফাৎ শুধু এই টুকু যে, ইহারা নামায পড়িয়া থাকে আর শাহাদতের কলেমা উচ্চারণ করে। আমরা এই যুগসন্ধিক্ষণে জন্মলাভ করিয়াছি, জানিনা অতঃপর আল্লাহর অভিপ্রায় কি?" [১ম খণ্ড, ১৫৮।]

শাহ সাহেব দুই শত বৎসর পূর্বকার অবস্থার জন্য বিলাপ করিয়াছেন অথচ তাঁহার ভাষায় তৎকালে মুসলমানগণ 'নামায আদা করিতেন এবং শাহাদৎ মন্ত্রও উচ্চারণ করিতেন।' কিন্তু দুইশত বৎসর পর কুরআন ও হাদীসের সহিত সরাসরি

সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়া আজ মুসলমানদের অবস্থা যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতি ও শরীঅতের বিধি নিষেধের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃমণ্ডলী ও তথাকথিত আধুনিকতাবাদিগণের যে নিদারুণ বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছে, শাহ সাহেব এই ভয়াবহ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে কি মন্তব্য করিতেন কে জানে?

যে সকল অনুসরণীয় মহামতি ইমামকে উপলক্ষ করিয়া এক ও অখণ্ড আহ্‌লে-সুন্নত ওয়াল জামাআত আজ বিভিন্ন দলে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তন্মধ্যে হযরত ইমাম আবু হানীফা, হযরত ইমাম মালিক বিনে আনাস, হযরত ইমাম শাফেয়ী, হযরত ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল, হযরত ইমাম রবীআতুররায়, হযরত ইমাম ইবনো আবি লায়লা, হযরত ইমাম আওযায়ী, হযরত ইমাম সুফয়ান সওরী, হযরত ইমাম লয়েস বিনে স'অদ, হযরত ইমাম ইসহাক বিনে রাহওয়ে হযরত ইমাম আবু সওর, হযরত ইমাম বুখারী, হযরত ইমাম দাউদ যাহেরী, হযরত ইমাম ইবনে জরীর, হযরত ইমাম ইবনে খুযায়মা এবং হযরত ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহারা যথাক্রমে ১৫০, ১৭৯, ২০৪, ২৪১, ১৩৬, ১৪৮, ১৫৭, ১৬১, ২২৭, ১৭৫, ২৪০, ২৫৬, ২৭০, ৩১০, ৩১১ ও ৭২৮ হিজরীতে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ফলকথা- অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যে অর্থাৎ যাঁহাদের উক্তি ও সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া আহ্‌লে সুন্নতগণ ফিরকাবন্দীকে জন্ম দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই ৮০ হিজরীর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অথচ এই সময়ের অনেক পূর্বেই ইসলাম জগতের বিজিত অঞ্চলগুলি ইসলামের পদানত হইয়াছিল এবং উল্লিখিত অঞ্চলসমূহে একমাত্র কুরআন ও হাদীসের বিজয় পতাকা উড্ডীন ছিল। বর্তমান যুগের প্রচলিত আহলে সুন্নত মযহবগুলি কোন সময়ে বিভিন্ন মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করিব।

শাম বা সিরীয়া ঃ দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুকের সময়ে ১৪ হিজরীতে আমীনুল উম্মত আবু উবায়দাহ বিনুল জররাহ এবং বীরকেশরী সায়ফুল্লাহ খালেদ বিনুল ওলীদ উহা জয় করেন।

ইরাক বা মেসোপটেমিয়া ঃ হযরত উমরের শাসনকালে স'অদ বিনে আবিওয়াক্কাসের নেতৃত্বে বিজিত হয়।

আযরবাইজান ঃ হযরত উমরের সময় ২২ হিজরীতে মুগীরা বিনে শো'বা কর্তৃক অধিকৃত হয়।

খোরাসান ঃ কতকাংশ ২২ হিজরীতে হযরত উমরের সময় এবং অবশিষ্টাংশ হযরত উসমানের শাসন কালে [২৬-৩১ হিঃ] অধিকৃত হয়।

কিরমান ঃ ২৩ হিজরীতে আবদুল্লাহ বিনে বুদায়েলে খোযায়ী হযরত উমরের সময়ে জয় করেন।

সিসতান ঃ কতকাংশ উমর ফারুকের সময়ে আর কতক আমীর মুআবিয়ার সময়ে বিজিত হয়। আরমেনিয়া, ককেশাস, খোরাসান, কিরমান, সিস্‌তান ও সাইপ্রাস দ্বীপ হযরত উসমানের খেলাফতে [২৩-৩৫ হিঃ] অধিকৃত হয় বলিয়া যারক্কী স্বীয় চরিতাবিধানে উল্লেখ করিয়াছেন। মকরেযী বলিয়াছেন,

لمّا قام هارون الرشيد الخلافة وولى القضاء أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم أحد أصحاب أبى حنيفة سنة ١٧٠ هجرى، فلم يقلد يبلاد العراق وخراسان ومصر إلاّ مَن اشاربه القاضى أبو يوسف واعتنى به -

যখন হারুণ রশীদ ১৭০ হিজরীতে খেলাফতের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন তখন তিনি ইমাম আবু হানীফার অন্যতম প্রধান ছাত্র আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিনে ইবরাহীমকে ১৭০ হিজরীতে বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব দান করিলেন। অতঃপর কাযী আবু ইউসুফের ইঙ্গিত ও অনুমোদন ব্যতীত ইরাক, খোরাসান, শাম ও মিসর দেশে কাহারও পক্ষে শাসন ও বিচার বিভাগে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রহিল না [মকরেযী [৪] ১৪৪ পৃষ্ঠা]। হুজ্জাতুল ইসলাম দেহলভী বলিয়াছেন ঃ ইমাম আবু হানীফার প্রধান শিষ্য কাযী আবু ইউসুফ খলীফা হারুণ রশীদের রাজত্বকালে প্রধান বিচার সচিবের পদে অধিষ্ঠিত হন।

فكان سببا لظهور مذهبه والقضاء به فى أقطار العراب وخراسان وما وراء النهر -

ফলে তাঁহার কারণেই ইরাক,খোরাসান ও নহরপার. [Transoxiana] দেশসমূহে হানাফী মযহব প্রসার লাভ করে এবং উক্ত মযহব সূত্রে বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত হয় [হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা ১৫১ পৃষ্ঠা]। আল্লামা ইয়াফেয়ী [-৭৭৮ হিঃ] কাযী আবু ইউসুফ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, তিনিই সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানীফার মযহব পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারিত করেন [ইয়াফেয়ীর ইতিহাস [১] ৩৮৩ পৃষ্ঠা]। মওলানা শায়েখ আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী বলিতেছেন, কাযী আবু ইউসুফ বিশেষ ভাবে ইমাম আবু হানীফার শিষ্যত্ব দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করেন এবং তাঁহার মধ্যে আহলে রায়ের- যুক্তিবাদীগণের মযহবের প্রভাব বদ্ধমূল হইয়া যায়। তিনি ইসলাম জগতের তৎকালীন রাজধানী বাগদাদের প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন এবং আজীবন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া হারূণের রাজত্বকালেই পরলোকবাসী হন। আবু ইউসুফের পুত্র ইউসুফ পিতার জীবিতকালেই বাগদাদ নগরীর পশ্চিমাংশের কাযী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১৯২ হিজরীতে পরলোক

গমন করেন। আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানীফার ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তিনিই সর্ব-প্রথম স্বীয় উস্তাযের মযহব অনুসারে পুস্তকাদি রচনা করেন এবং ইমামের মসআলাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতাকালে পেশ করেন। তাঁহার দ্বারাই পৃথিবীর সর্বত্র ইমাম আবু হানীফার মযহব প্রসার লাভ করে [ফওয়ায়েদুল বহীয়াহ, ৯৪পৃষ্ঠা]।

ইবনে-ফরহুন বলিতেছেন, কাযী ইবনে উসমান দেমশকী দেমশকের কাযী নিযুক্ত হন। তিনি স্বয়ং শাফেয়ী মযহব সূত্রে বিচার করিতেন এবং পরবর্তী দল তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ইমাম শাফেয়ীর শিষ্য মুযনীর "মুখতসর" নামক গ্রন্থ তাঁহাকে কেহ মুখস্ত শুনাইতে পারিলে তিনি তাহাকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিতেন। ইবনে উসমান ৩০৩ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হিজরীর ৪র্থ শতক পর্যন্ত শামে ইমাম আওযায়ীর মযহবও প্রচলিত ছিল [ফতাওয়ায় ইবনে তয়মিয়াহ [২], ৩৭৪ পৃষ্ঠা।]

মকরেযী বলিতেছেন, নুরুদ্দীন জঙ্গী [৫৫৯ হিঃ] দেমশক, পূর্ব সিরিয়া বা শামের সমগ্র অংশ এবং পশ্চিম শামের কতকাংশ এবং মসুল প্রভৃতির অধিপতি ছিলেন। তিনি হানাফী মযহব অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং এই মযহবে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন, তাঁহার দ্বারাই শামে হানাফী মযহব প্রচারিত হয় [মকরেযী [৪], ১৬১ পৃষ্ঠা।]।

মধ্য তুর্কীস্তান বা নহরপার অঞ্চলে হানাফী মযহব প্রচলিত হওয়ার পর কফফাল শাশী শাফেয়ী মযহব প্রচার করেন। শাশী ৩৬৫ হিজরীতে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। [শযরাতুয্‌যহব, [৩] ৫১ পৃষ্ঠা।]

স্পেন ঃ সর্ব প্রথম হযরত উসমানের খেলাফতে ২৭ হিজরীতে আবদুল্লাহ বিনে নাফে' প্রভৃতি সৈন্য পরিচালনা করেন এবং স্পেনে আংশিকভাবে আরবদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ৯২ হিজরীতে খলীফা ওলীদ বিনে আবদুল মালেকের সময়ে মহাবাহু তারীক বিনে যিয়াদ [৫০-১০২ হিঃ] সম্পূর্ণরূপে স্পেন অধিকার করিয়া লন [ইবনে কসীর [৭], ১৫২ পৃঃ, ইবনে জরীর [৮], ৮২ পৃঃ।] ঐতিহাসিকগণ সমবেতভাবে বলিয়াছেন যে, স্পেনে সর্ব প্রথম ঈসা বিনে দীনার [মৃঃ ২২১ হিঃ] মালেকী মযহব প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে স্পেনের অধিবাসীবৃন্দ ইমাম আওযায়ী [মৃঃ ১৫৭ হিঃ] ও ইমাম মকহুল কাবুলী শামী [মৃঃ ১১৩ হিঃ] উভয়ের মযহব মান্য করিয়া চলিত।

মকরেযী লিখিয়াছেন, হিশামের পুত্র হাকাম রাবাযী [মৃঃ ২০৬] পিতার পরলোকগমনের পর ১৮০ হিজরীতে "মুন্‌তাসির" উপাধি ধারণ করিয়া স্পেনের সিংহাসনে সমারূঢ় হন এবং ইয়াহ্‌য়া বিনে কসীর বিনে মসমুদী লয়সী উন্দলসী [মৃঃ ২৩৪ হিঃ] কে প্রধানমন্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন। মসমুদী স্বয়ং ইমাম মালেকের নিকট হইতে তাঁহার হাদীসগ্রন্থ মুওয়াত্তা শ্রবণ করিয়াছেন এবং ইমাম মালেকের

প্রধান শিষ্যমণ্ডলী আবদুল্লাহ বিনে ওয়াহ্‌হাব [মৃঃ ১৯৭ হিঃ] ও আবদুর রহমান বিনুল কাসেম [মৃঃ ১৯১ হিঃ] প্রভৃতির নিকট হইতে মালেকী মযহবে বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত দক্ষতা অর্জন করিয়া স্পেনে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। সমগ্র স্পেনে তাঁহার তুল্য সম্মান ও প্রতিপত্তি অন্য কেহই অর্জন করিতে পারেন নাই। সর্ববিধ ফত্‌ওয়া একমাত্র তাঁহার নির্দেশক্রমে প্রদান করা হইত, সুলতান স্বয়ং মসমুদীর গৃহদ্বারে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় উপস্থিত হইতেন। উন্দুলুসে মসমুদের ইঙ্গিত ও অনুমোদন ছাড়া কাহারও পক্ষে রাজ কার্যে প্রবেশ করার উপায় ছিল না। স্পেনের অধিবাসীবৃন্দ মূলতঃ ইমাম আওযায়ীর মযহবের অনুসরণকারী হইলেও মসমুদীর প্রভাবে পরবর্তীকালে তাঁহারা ইমাম মালেকের মযহব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন [মক্‌রেযী [৪] ১৪৪ পৃঃ।]

৫৫৮ হিজরীতে ইউসুফ বিনে আবদুল মু'মিন [মৃঃ ৫৮০ হিঃ] আমীরুল ম'মিনীন উপাধি গ্রহণ করিয়া মরক্কো, আলজেরীয়া ও স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমীরুল মু'মিনীন ইউসুফ স্বয়ং আহলে হাদীস ছিলেন। সহীহ বুখারী আগাগোড়া তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি কুরআন, হাদীস, আরবী সাহিত্য ও ইতিহাস শাস্ত্রে সমধিক বুৎপত্তি রাখিতেন এবং মিষ্টভাষী ও সদা-প্রফুল্ল ব্যক্তি ছিলেন। হাফিজ যহবী তারিখুল ইসলামে লিখিয়াছেন, আবু বকর বিনে জুদানা বলিতেছেন, আমি একদা ইউসুফ বিনে আবদুল মু'মিনের নিকট গমন করি, আমি দেখিতে পাই, তাঁহার সম্মুখে কুরআন, সুনানে আবু দাউদ ও তরবারি রক্ষিত রহিয়াছে। আমীরুল মু'মিনীন এগুলির দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, এই তিন বস্তুছাড়া সমস্তই ভুল [ইয়াফেয়ী [৩] ৪১৭ পৃঃ]।

৫৮০ হিজরীতে তদীয় পুত্র ইয়াকুব [৫৫৪-৫৯৫] পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিদ্বান, সুন্নতের প্রতিষ্ঠাতা ও মহাবীর ছিলেন, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের কবল হইতে তিনি ৪টি নগরী উদ্ধার করিতে সমর্থ হন এবং ৫৯২ হিজরীতে তাহাদের এক বিরাট ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে পর্যুদস্ত করেন।। তাঁহার ধর্মীয় মতবাদ ও রাজ্যশাসন বিধি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে খল্লকান মন্তব্য করিয়াছেন, "তিনি প্রজাপুঞ্জকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য শাসন করিতেন। মদ্য পানের অপরাধে কখন কখন অপরাধীকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। তাঁহার নিযুক্ত শাসকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে জনগণ অভিযোগ করিলে শাসনকর্তাদিগকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। তিনি ব্যবহারিক বিভিন্ন ফিক্‌হ গ্রন্থ সমূহের পঠন ও পাঠন বন্ধ করার আদেশ দিয়াছিলেন এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র সারকুলার জারি করিয়া দিয়াছিলেন যে, কুরআন ও সুন্নত [হাদীস] ছাড়া ফকীহগণ ফত্‌ওয়া দিতে পারিবেন না এবং পূর্ববর্তী মুজাহিদ দলের কাহারও তকলীদ করা [বিনা প্রমাণে কাহারও শর্য়ী সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া] চলিবে না। ফকীহগণ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে স্ব স্ব

ইজতেহাদ প্রয়োগ করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন [ইবনে খল্লকান [২] ৩২৮ পৃঃ।]।

সম্রাট যুগল পশ্চিম দেশসমূহে আহলে হাদীস মতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্বে ও পরে স্পেন এবং মরক্কো ভূমি হইতে এমন একদল আহলে হাদীস ফকীহ ও মুহাদ্দিস উত্থিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের যশঃ সৌরভে আজ পর্যন্ত পৃথিবী আমোদিত রহিয়াছে। পুঁথি বাড়িয়া যাওয়ার ভয়ে নিম্নে কয়েকটি নাম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি।

১। ইমাম কাসেম বিনে মুহাম্মদ বিনে কাসেম বিনে মুহাম্মদ কর্তবী, [মৃঃ ২৭৬ হিঃ]। । ইমাম বক্কী বিনে মখলদ আবু আবদুর রহমান কর্তবী, [জন্ম ২৩১, মৃঃ ২৭৬ হিঃ]। ৩। ইমাম মুহম্মদ বিনে ওয়ায্যাহ ইবনে বুযায়অ' আবু আবদুল্লাহ কর্তবী, [জন্ম ২০০, মৃঃ ২৭৯ হিঃ] ৪। ইমাম মুহাম্মদ বিনে ইব্রাহীম উন্দুলসী, [মৃত্যু ৩০৫হিঃ]। ৫। মুহাদ্দীসুল উন্দুলস আবু জা'ফর আহমদ বিনে আমর বিনে মনসুর উন্দুলুসী, [মৃঃ ৩১২ হিঃ]। ৬। হফেয মুহাম্মদ বিনে ফোতায়েস আবু আবদুল্লাহ উন্দুলসী, [২২৯-৩১৯ হিঃ]। ৭। হাফেয আবু আলী হাসান বিনে স'অদ বিনে ইদ্রিস কেনানী কর্তবী, [মৃঃ ৩১১ হিঃ]। ৮। ইমাম মুহাম্মদ বিনে আবদুল মালেক আবু আবদুল্লাহ কর্তবী, [মৃঃ ৩৩৩ হিঃ]। ৯। ইমাম কাসেম বিনে আসবগ বিনে মুহাম্মদ বিনে ইউসুফ কর্তবী, [২৪৭-৩৪০ হিঃ]। ১০। খালেদ বিনে স'অদ আবুল কাসেম উন্দুলসী, [মৃঃ ৩৫২ হিঃ]। ১১। খল্‌ফ বিনুল কাসেম আবুল কাসেম ইবনুদ্ দব্বাগ উন্দুলসী [৩২৫-৩৭৩ হিঃ]। ১২। ইয়াহ্‌ইয়া বিনে মালেক আবু যাকারিয়া উন্দুলসী [৩৭৬ হিঃ]। ১৩। আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিনে মুহাম্মদ লখ্‌মী আশ্‌বেলী, [মৃঃ ৩৭৮ হিঃ]। ১৪। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিনে আহমদ ইবনে মুফাররজ কর্তবী, [মৃঃ ৩৮০ হিঃ]। ১৫। আহমদ বিনে মুহাম্মদ বিনে আবিদ আসাদী কর্তবী, [৩৮৯ হিঃ]। ১৬। আবদুল্লাহ বিনে ইব্রাহীম আসিলী উন্দুলসী, [৩৯২ হিঃ]। ১৭। আবু উমর আহমদ বিনে আবদুল্লাহ ইবনুল বাজী আশবেলী, [৩৯৬ হিঃ]। ১৮। আবু মৎরফ আবদুর রহমান বিনে মুহাম্মদ ইবনে ফুতায়স কর্তবী, [৪০২ হিঃ]। ১৯। আবু মুহাম্মদ আতীঈয়াহ্ বিনে সঈদ উন্দুলসী, [৪০৮ হিঃ]। ২০। শাইখুল ইসলাম আবু আমর উসমান বিনে সঈদ দানী কর্তবী, [৪৪৪ হিঃ]। ২১। ইমাম আলী বিনে সঈদ ইবনে হযম উন্দুলসী, ৪৫৬ হিঃ]। ২২। ইমাম ইউসুফ বিনে আবদুল্লাহ আবু আমর ইবনে আব্দিল বর, [৪৬৩ হিঃ]। ২৩। আবু আলী হুসাইন বিনে মুহাম্মদ সদফী সরকিস্ত উন্দুলসী, [৫১৪ হিঃ]। ২৪। আবুল ওলীদ ইউসুফ বিনে আবদুল আযীয ইবনুদ দব্বাগ লখমী উন্দুলসী, [৫৪৬ হিঃ]। ২৫। আবু বকর মুহাম্মদ বিনে খায়ের আশবেলী, [৫৭৫ হিঃ]। ২৬। আবদুল হক বিনে আবদুর রহমান আবু মুহাম্মদ আযদী ইবনুল খিরাৎ আশবেলী, [৫৮১ হিঃ]। ২৭। আবুল কাসেম আবদুর রহমান বিনে মুহাম্মদ বিনে উবায়দ আনসারী উন্দুলসী, [৫৮৪ হিঃ]।

২৮। শায়খুল মগ্‌রেব আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিনে মুহাম্মদ ইব্‌নে উবায়দুল্লাহ হিজরী উন্দুলসী, [৫৯১ হিঃ]। ২৯। আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিনুল হাসান বিনে আহমদ আবু বকর কর্তবী, [৬১১ হিঃ]। ৩০। আবদুল্লাহ বিনে সুলায়মান বিনে দাউদ আনসারী হারেসী উন্দুলসী, [৬১২ হিঃ]। ৩১। ইমাম আবুল খত্‌তাব উমর বিনুল হাসান ইব্‌নে দাহ্‌য়া কলবী উন্দুলসী, [৫৪৪-৬৩৩ হিঃ]। ৩২। ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ বিনে মুহাম্মদ ইব্‌নুর রুমিঈয়হ আশবেলী উন্দুলসী, [৬৩৭ হিঃ]। ৩৩। ইমাম আবু বকর মহীউদ্দিন মুহাম্মদ বিনে আলী হাতেমী ইবনে আরাবী উন্দুলসী, [৫৬০-৬৩৮ হিঃ]। ৩৪। ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ বিনে আহমদ ইবনে সৈয়েদুন্নাস আশ্‌বেলী উন্দুলসী, [৬৫৯ হিঃ]। ৩৫। ইউসুফ বিনে আবদুল্লাহ বিনে সঈদ আবু আম্‌র বিনে ইবাদ উন্দুলসী, [৬৭৫ হিঃ]। ৩৬। শাহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ বিনে ফরহ্‌লখ্‌মী আশবেলী, [৬৯৯ হিঃ]।

আফ্রিকা ঃ তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের শাসনকালে ২৭ হিজরীতে আব্দুল্লাহ বিনে স'অ্দ বিনে আবি সরহ, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন প্রভৃতি সাহাবা কর্তৃক আফ্রিকা অধিকৃত হয় [শযরাত (১) ৩৬ পৃষ্ঠা, কামুস (২) ৫৫৭ পৃষ্ঠা]

মকরেযী লিখিয়াছেন, আফ্রিকায় কুরআন, সুন্নত ও সাহাবাগণের ফতওয়ার প্রভাব অগ্রগণ্য ছিল। সর্বপ্রথম ১৭৬ হিজরীতে আবদুল্লাহ বিনে ফররুখ আবু মুহাম্মদ আলফারসী [মৃত্যু ১৭৪ হিজরী] আফ্রিকায় হানাফী মযহব লইয়া প্রবেশ করেন।

মকরেযী ফারসী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাহা প্রমাণিত নয়। আবদুল্লাহ বিনে ফররুখকে হাফিয ইবনে হজর খোরাসানী লিখিয়াছেন, আবার তাঁহাকে ইয়ামানীও বলা হইত। তাঁহার সম্বন্ধে ইবনে ইউনুস বলিয়াছেন যে, তিনি আফ্রিকায় বাস করিতেন, ১১৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৭৪ হিজরীতে মিসর আগমন করেন এবং ঐ বৎসরেই হজ্জ করিয়া ফিরিয়া যান, তিনি বিখ্যাত আবেদগণের অন্যতম ছিলেন।

আবুল আরব "তাবাকাতে আফ্রিকীয়া" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বিদ্যা অর্জন করার উদ্দেশ্যে ইবনুল ফারসী দেশ পর্যটন করেন এবং প্রাচ্যে ইমাম মালেক, সওরী, আবু হানীফা, ইবনে জোরায়জ প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। ইমাম মালেকের সহিত তিনি পত্রালাপ করিতেন এবং ইমাম মালেকও পত্রযোগে তাঁহার জিজ্ঞাসা-সমূহের উত্তর দিতেন। ইবনে ফররুখ বিশ্বস্ত ছিলেন [তহ্‌যীবুত তহযীব [৫] ৩৫৬ পৃষ্ঠা।]।

যরক্লী তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ বিনে ফররুখ ফারসী আফ্রিকার অধিবাসী আহলে হাদীসগণের অন্যতম ছিলেন। রওহ বিনে হাতিম তাঁহাকে বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার আদেশ দেওয়ায় তিনি উক্ত আদেশ

অমান্য করেন এবং হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বহির্গত হন। হজ্জ সমাধা করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে মিসরে ১৭১ হিজরীতে পরলোকবাসী হন [কামুস [২] ৫৭৩ পৃষ্ঠা।]।

মকরেযী ইহাও লিখিয়াছেন যে, আফ্রিকায় কাযী আসাদ বিনুল ফুরাত বিনে সিনান [মৃত্যু ২১৭ হিজরী] সর্ব প্রথম হানাফী মযহব প্রচলন করেন।

ইনি কায়রোয়ানের কাযী ছিলেন। ইমাম মালেক, কাযী আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসান প্রভৃতির নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন

মালেকী ফিকহে "আসাদিয়াহ" নামক তাঁহার এক খানা গ্রন্থ আছে। 'ইনতিকা' পুস্তকের টীকায় লিখিত হইয়াছে- কায়রোয়ানের কাযী সিসিলী-বিজেতা আসাদ বিনুল ফুরাত কায়রোয়ানে মালেক ও আবু হানীফার মযহব প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তিনি শুধু হানাফী মযহব প্রচার করার কার্য্যে ব্রতী হন। তাঁহার প্রচেষ্টায় স্পেনের সীমা পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিকাংশ অধিবাসী হানাফী মযহবে দীক্ষিত হন। পরবর্তীকালে ইবনে বাদেশের সময়ে এই ভাবের বিপর্যয় ঘটিয়াছিল [ইনতিকা, ৫১ পৃষ্ঠা।]।

মকরেযী বলেন, অতঃপর সহনুন বিনে সাঈদ তনূখী [মৃত্যু- ১৪০ হিজরী]। আফ্রিকার বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি আফ্রিকাবাসীগণের মধ্যে মালেকী মযহব প্রচার করিতে ব্রতী হন। অতঃপর আফ্রিকার সুলতান মুইয্য বিনে বাদেশ [মৃত্যু ৪৫৪ হিঃ] আফ্রিকার সমগ্র অধিবাসীকে মালেকী মযহব গ্রহণ ও অন্যান্য সমুদয় মযহব বর্জন করিবার জন্য প্ররোচিত করেন। সুলতানের সন্তুষ্টি অর্জন ও বৈষয়িক স্বার্থ সিদ্ধি লাভের আশায় আফ্রিকা ও স্পেনের সমুদয় অধিবাসী মালেকী মযহব বরণ করিয়াছিলেন। তখন বিচার ও ফতওয়ার কার্য্য মালেকী মযহবের ফকীহগণ ছাড়া সমগ্র আফ্রিকার কোন নগর বা পল্লীতে অপর কাহারও পক্ষে লাভ করার উপায় ছিল না। জনসাধারণকে নিরুপায় হইয়া মালেকী মযহবের আদেশ ও ফতওয়া মান্য করিয়া চলিতে হইত। এইভাবে পশ্চিম দেশ সমূহের সর্বত্র মালেকী মযহব ছড়াইয়া পড়িল [মকরেযী [৪] ১৪৪ পৃষ্ঠা]। ইবনে ফরহুন [মৃত্যু ৭৯৯ হিজরী] লিখিয়াছেন, ৪০০ হিজরীর পর আফ্রিকায় পুনরায় হানাফী মযহব প্রবেশ করিতে থাকে।

মিসর ঃ দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারুকের সময়ে ২০ হিজরীতে আম্‌র বিনুল আস কর্তৃক অধিকৃত হয়।

মকরেযী লিখিয়াছেন যে, মিসরে সর্ব প্রথম আবদুর রহীম বিনে খালিদ বিনে ইয়াযীদ বিনে ইয়াহয়া ইমাম মালেকের মযহব লইয়া প্রবেশ করেন। তিনি স্বয়ং ফকীহ্ ছিলেন। লয়েস, ইবনে ওয়াহ্হাব ও রশীদ বিনে স'অদ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৬৩ হিজরীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় পরলোক গমন করেন। খুলাসা গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, ইমাম লয়েস আবদুর রহীমের পিতা

খালিদ বিনে ইয়াজিদ মিসরী সেকেন্দ্রানীর শিষ্য ছিলেন, তিনি ১৩৯ হিজরীতে পরলোকবাসী হন। খালিদ বিখ্যাত তাবেয়ী আতা বিনে আবী রীবাহ [মৃত্যু ১১৫ হিঃ] ও ইবনে শিহাব [মৃত্যু ১২৪ হিঃ] প্রমুখ বিদ্বানগণের নিকট হইতে বিদ্যা অর্জন করেন [খুলাসা ঃ ১০৪ পৃষ্ঠা]। আবদুর রহীম বিনে খালিদ ইমাম মালিকের ১৬ বৎসর পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর ১২ বৎসর পর ইমাম লয়েস পরলোকবাসী হইয়াছিলেন। ইমাম লয়েস তাঁহার জীবদ্দশায় স্বয়ং মিসরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন।

মকরেযী বলেন, ইমাম মালেকের প্রধানতম শিষ্যগণের অন্যতম ও মালেকী ফিক্হ গ্রন্থ "মুদাওয়ানে"র সঙ্কলয়িতা আবদুর রহমান বিনুল কাসেম [১২৮-১৯১ হিঃ] মিসরে মালেকী মযহব প্রচার করিতে থাকেন, ফলে হানাফী মযহব অপেক্ষা মিসরে মালেকী মযহব অধিকতর প্রসারিত হয়।

খলীফা মনসূর আব্বাসীর সময়ে আবদুল্লাহ বিনে লহীয়া [৯৭-১৫৪ হিঃ] মিসরের কাযী নিযুক্ত হন। ১৫৪ হইতে ১৬৪ হিজরী পর্যন্ত তিনি মিসরের বিচারাসন অলংকৃত করিয়াছিলেন। ইবনে আবি লহীয়া আহলে হাদীস ছিলেন। অতঃপর কাযী আবু ইউসুফের নির্দেশ-ক্রমে ইসমাঈল বিনে আল-ইয়াসা কুফী মিসরের কাযী নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রভাবে হানাফী মযহবের ফতওয়া প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে। ১৯৮ হিজরীতে ইমাম শাফেয়ী মিসরে পদার্পণ করিলে মিসরের শীর্ষস্থানীয় বিদ্বানগণের মধ্যে আবদুল হাকামের বংশধরগণ- যথা আবদুল্লাহ বিনে আবদুল হাকাম [মৃঃ ২১৪ হিঃ], মুহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ বিনে আবদুল হাকাম [মৃঃ ২৭৮ হিঃ], রুবাইয়া বিনে সুলাইমান [মৃঃ ২৭০ হিঃ] ইসমাঈল বিনে ইয়াহ্য়া মুযানী [মৃঃ ২৬৪ হিঃ] ও ইউসুফ বিনে ইয়াহইয়া বুওয়ায়তী [মৃঃ ২৩১ হিঃ] প্রভৃতি ইমাম শাফেয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা সকলেই শাফেয়ী মযহবে দীক্ষিত হন। এই প্রকারে মিসরে শাফেয়ী মযহব প্রতিষ্ঠালাভ করে আর ঘরে ঘরে ইমাম শাফেয়ীর নাম আলোচিত হইতে থাকে।

২৫৩ হিজরী পর্যন্ত মিসরের প্রাচীন জামে মসজিদে মিসরবাসীগণ নামাযে উচ্চৈঃস্বরে 'বিসমিল্লাহ" ও "আমীন" বলিতেন। কিন্তু এই বৎসরেই মযাহেম বিনে খাকান মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং তাঁহার নির্দেশক্রমে পুলিশের প্রধানকর্তা জামে মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে "বিসমিল্লাহ" ও "আমীন" বলার নিয়ম রহিত করিয়া দেন। তখন পর্যন্ত মিসরের অধিবাসীবৃন্দ যুগপৎভাবে মালেকী ও শাফেয়ী মযহবের অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং বিচারকার্যের ভার হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মযহবত্রয়ের ফকীহগণই প্রাপ্ত হইতেন।

মিসরে শিয়া মযহবের প্রবেশ

আফ্রিকা ও পশ্চিম দেশসমূহে সর্ব প্রথম শিয়া [ফাতেমী] রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা আবু তমীম আল-মঈয্য লে-দীনিল্লাহ [মৃত্যু ৩৬৫ হিঃ] ৩৫৮ হিজরীতে তদীয় আরমানী কৃতদাস জেনারেল কায়েদ জওহরকে মিসর অভিযানে প্রেরণ করেন। উক্ত সনের ১৮ই শা'বান তারিখে ফাতেমীগণ কর্তৃক মিসর অধিকৃত হয় এবং আব্বাসী খলিফাগণের নামে জুমা'র খুৎবা পাঠ করার রীতি রহিত হইয়া যায়। কায়েদ জওহর মিসরের বিখ্যাত কাহেরা বা কায়রো নগরী নির্মাণ করেন। ইহার পর হইতে মিসরে শিয়া মযহব প্রসারিত হইতে থাকে। কায়েদ জওহর ৩৮১ হিজরীতে পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

৫৫৪ হিজরীর জামাদিস্সানিয়াতে সুলতান আল-মালেকুননাসীর সালাহুদ্দীন ইউসুফ বিনে আইয়ুব [৫৩২-৫৮৯ হিঃ] মিসর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ফাতেমীদের বিলোপ সাধনকল্পে অগ্রসর হন এবং মিসরে শাফেয়ী ও মালেকীদের জন্য পৃথক পৃথক কলেজ স্থাপন করেন। বিচারালয় সমূহ হইতে শিয়া কাযীদিগকে অপসারিত করিয়া সদরুদ্দীন আবদুল মালেক বিনে দর্‌রাস আলমারানী শাফেয়ী [৫১৬-৬০৫ হিঃ] কে প্রধান বিচার সচিবের পদে নিযুক্ত করেন। আল-মারানী শাফেয়ী ছাড়া অন্য কোন মযহবের ফকীহকে মিসর রাজ্যে কাযী নিযুক্ত করিতেন না। তখন হইতে মিসরে শাফেয়ী ও মালেকী মযহবদ্বয়ের উত্থান ঘটে এবং ফাতেমী ইসমাঈলী ও ইমামীদের মযহব অবলুপ্ত হইতে থাকে এবং কালক্রমে এই সকল মযহবের অস্তিত্ব মিসর হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় [মক্‌রেযী [৪] ১৬১ পৃঃ]। সুলতান নুরুদ্দীনের প্রচেষ্টায় এই সময়ে মিসরে হানাফী মযহবও পুনরায় প্রচলিত হইতে থাকে।

মকরেযী লিখিয়াছেন, ৬৫৮ হিজরীতে সুলতান আল-মালেকুয্যাহের বেবরস বন্দকদারী [৬২৫-৬৭৬ হিঃ] মিসরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া মিসরে ও কায়রো নগরীতে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মযহব চতুষ্টয়ের জন্য পৃথক পৃথক কাযী নিযুক্ত করিলেন। ৬৬৫ হইতে এই রীতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তখন হইতে ইসলাম জগতের সমস্ত নগরে উল্লিখিত মযহব চতুষ্টয় এবং ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরীর [২৬০-৩২৪ হিঃ] আকীদা ব্যতীত অন্য কোন মযহব ও আকীদা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচিত রহিল না। ইসলাম জগতের অন্তর্গত সমস্ত দেশে মাদ্‌রাসা, খানকাহ ও তাকইয়াগুলিতে উল্লিখিত রীতি প্রচলিত করা হইল। যাহারা সুলতান ও কাযীগণের প্রবর্তিত ও প্রতিপালিত চারি মযহব ছাড়া অন্য কোন মযহব অনুসারে চলিতে চাহিল, তাহাদের সঙ্গে বৈরিভাব পোষণ করা

হইল এবং তাহারা গর্হিত পথে চলিয়াছেন বলিয়া বিঘোষিত হইল। যাহারা চারি মযহবের অন্তর্ভুক্ত কোন একটির মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখিতে পারিল না, তাহারা কোন রাজকার্যে গৃহীত হইবার যোগ্য রহিল না, তাহাদের সাক্ষ্য আদালত সমূহে অগ্রাহ্য হইতে লাগিল। তাহাদের বক্তৃতা, ইমামত, শিক্ষকতা ও বিচারক পদের কোন কাজ পাইবার কোন অধিকার থাকিল না। সকল দেশেই ফকীহগণ ফতওয়া জারী করিলেন যে, প্রচলিত চারি মযহবের মধ্যে শুধু একটির নির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণ-নিরপেক্ষ ও গতানুগতিক নিয়মে অনুসরণ করা ওয়াজিব এবং চারি মযহবের বহির্ভূত অন্য কোন উক্তি বা সিদ্ধান্ত স্পষ্ট কুরআন ও বিশ্বস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইলেও তাহা অনুসরণ করা হারাম [মক্‌রেযী [৪] ১৬| পৃঃ]।

ফিরকাবন্দীর চরম পরিণতি স্বরূপ ৮০১ হিজরীতে সুলতান ফরূহ বিনে বর্কূক সরকেশী [৭৯১-৮১৫ হিঃ] পবিত্র কাবা গৃহের চতুস্পার্শে মযহব চতুষ্টয়ের জন্য চারিটি ভিন্ন ভিন্ন মুসল্লা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন [বদ্‌রুত তালে' [২] ২৬ পৃঃ]। তখন হইতে এক আল্লাহ "ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহুর" দীন এবং মুসলিম জাতির প্রতিষ্ঠাকেন্দ্র "কিয়া-মাল্‌লিন্নাস" [মায়েদা ঃ ৯৭] চারিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সাধক কবি রুমী ইসলাম জগতের এই ভয়াবহ চিত্র নিম্ন ভাষায় অংকিত করিয়াছেন ঃ

دین حق را چار مذهب ساختند

رخنه در دین نبی انداختند

অর্থাৎ সত্যধর্মকে চারিটি মযহবে বিভক্ত করিলেন, নবীর দীনে বিপর্যয় ঘটাইয়া দিলেন।

সাড়ে পাঁচশত বৎসর পর আল্লাহর অনুগ্রহ ইংগিতে সউদী আরবের সম্রাট সুলতান আবদুল আযীয আলে সউদের রাজত্বকালে ১৩৪৩ হিজরীতে কাবার হরম হইতে এই জঘন্য বিদআত উৎপাটিত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর সমুদয় মুসলিম আবার এক কেন্দ্রে একই জামাআতে মিলিত হইয়া নামায আদা করিতেছেন।

ফিরকাবন্দীর ভয়াবহ্ পরিণতি

ফির্কাবন্দীর যে মহাব্যাধি মুসলমানগণের জাতীয় জীবনে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল তাহাতে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন শিয়া সম্প্রদায় ও দলপন্থী সুন্নীগণ। উত্তরকালে এই শিয়া সুন্নীর লড়াই আর মযহব

চতুষ্টয়ের অন্ধ অনুগামীগণের উদ্দাম, অবিশ্রান্ত ও নির্মম গৃহযুদ্ধের ফলেই মুসলিমগণের জাতীয় গৌরবের উজ্জ্বল দিবাকর অবশেষে অস্তমিত হইয়া যায়।

ঐতিহাসিক আবুল ফিদা [৬৭২-৭৩২] ৩১৭ হিজরীর ঘটনা-সমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, কুরআনের আয়াত ঃ

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

"শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে মকামে মাহ্মুদে উন্নীত করিবেন" [বনী-ইসরাইল, ৭৯ আয়াত।]

আয়াতের অন্তর্ভুক্ত মকামে মাহ্মুদের ব্যাখ্যা লইয়া বাগদাদ নগরে হাম্বলী ও অপর মযহবত্রয়ের অনুসারীগণের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যায় এবং সৈন্য বাহিনী ও জনসাধারণ এই সংগ্রামে যোগদান করে এবং শত সহস্র লোক হতাহত হয় [[২] ৭৪পৃঃ।]

৩২৩ হিজরীর ঘটনাসমূহের আলোচনায় তিনি বলিতেছেন, পুলিশের বড়কর্তা হাম্বলীদিগকে শাফেয়ীগণের পদ্ধতিতে নামায পড়িবার জন্য বাধ্য করেন এবং নামাযে বিসমিল্লাহ উচ্চ কণ্ঠে পাঠ না করিলে হাম্বলীদের কাহাকেও ইমামতী করার অধিকার দেওয়া হইবে না বলিয়া আদেশ জারী করেন! খলীফা রাযীবিল্লাহ [মৃঃ ৩২৯ হিঃ] হাম্বলীদিগকে তাহাদের মতবাদ পরিহার করার আদেশ দেন এবং তাহাদিগকে তুলনাবাদী বা 'মুশাব্বিহা' বলিয়া তিরস্কার করেন। খলীফা স্বীয় বিজ্ঞপ্তিতে শপথ করেন যে, হাম্বলীগণ নিরস্ত না হইলে তরবারীর দ্বারা তাহাদিগকে নিহত এবং তাহাদের আবাস গৃহ জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করা হইবে। ৭ বৎসর পর্যন্ত এই হাম্বলী ও শাফেয়ী সংঘর্ষ চলিতে থাকে [আবুল ফিদা [২] ৮২ পৃঃ]।

ঐতিহাসিক যহবী লিখিয়াছেন, ৩৯৮ হিজরীতে বাগদাদ শহরে সুন্নী ও শিয়াগণের মধ্যে এক ভয়াবহ সংঘর্ষ সংঘটিত হয় এবং এই যুদ্ধে অসংখ্য লোক নিহত হয় [দুওয়ালুল ইসলাম [১] ১৮৬পৃঃ]

ইবনে খল্লকান বলেন, ইমাম কুশয়রী [৩৭৬-৪৬৫] ৪৪৮ হিজরীতে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং আকীদা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি লইয়া তিনি হাম্বলীদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন, কারণ তিনি স্বয়ং আশাএরা মতবাদে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। এই বিবাদ পরিশেষে সংগ্রামে পরিণতি লাভ করে এবং উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয় [[১] ৩০০পৃঃ]।

সুবকী [৭২৭-৭৭১] তাঁহার তাবাকতে লিখিয়াছেন যে, ইমাম ইবনুস সম্আনী মনসূর বিনে মুহাম্মদ মরওয়াযী [৪২৬-৪৮৯] হানাফী মযহব পালন করিতেন। ৪৬২ হিজরীতে হজ্জ করিতে গিয়া তিনি হানাফী মত পরিত্যাগ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তিত হইলে মযহব পরিবর্তন করার দরুণ তিনি বিশেষ

ভাবে উৎপীড়িত ও বিপন্ন হন, হানাফীরা তাঁহাকে কঠোর ভাবে দণ্ডিত করেন [[৪] ২২ পৃঃ]। সৈয়দ রশীদ রিযা তাঁহার তফ্সীরে লিখিয়াছেন যে, ইব্নুস্ সম্আনী শাফেয়ী মযহব অবলম্বন করায় শাফেয়ী ও হানাফীগণের মধ্যে ভীষণ লড়াই শুরু হইয়া যায় এবং ইহার ফলে মরও নগরী এবং খোরাসানের রাজধানী শ্মশানে পরিণত হয় [আলমানার [৩] ১১ পৃঃ]।

যহবী লিখিয়াছেন ৪৮৩ হিজরীতে বাগদাদ নগরে শিয়া ও সুন্নীগণের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ বাধে, বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং শাসন কর্তৃপক্ষ অবস্থা আয়ত্তে আনিতে অসমর্থ হন [দুওয়ালুল ইসলাম (২) ৮ পৃঃ]।

আফীফ ইয়াফেয়ী (৭৬৮ হিঃ) তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, ৫৫৪ হিজরীতে নেশাপুর শহরে হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়। শিয়ার দল হানাফী পক্ষে যোগদান করেন। প্রথমে শাফেয়ীরা পরাস্ত এবং তাঁহাদের বহু লোক নিহত হন। হানাফীরা হাটবাজার এবং শাফেয়ীদের মাদরাসা ও কলেজগুলি পোড়াইয়া দেন। শাফেয়ীরা পরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রবলতর ভাবে পালটা আক্রমণ চালান। নেশাপুর হানাফীয়া কলেজের বিরাট প্রাসাদ ভস্মীভূত করা হয় এবং শাফেয়ীদের যতগুলি লোক হানাফীরা নিহত করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হানাফীকে শাফেয়ীরা হত্যা করেন[(৩) ৩০৭ পৃঃ]। পুনশ্চ ৫৬০ হিজরীতে হানাফী শাফেয়ী সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, আট দিন পর্যন্ত লুটতারাজ ও নরহত্যা ব্যাপকভাবে চলিতে থাকে এবং বহু বাসগৃহ দগ্ধীভূত করা হয় [ঐ (৩) ৩৪৩ পৃষ্ঠা]।

ইয়াফেয়ী ও ইবনুল ইমাম লিখিয়াছেন যে, ৫৮২ হিজরীতে বাগদাদ নগরের রাজপথে ছাই বিছানো হয় আর ১০ই মুহাররম তারীখে চট টাঙ্গানো হয়। কর্খের অধিবাসীরা মাতন শুরু করেন আর শেষ পর্যন্ত ব্যাপার সাহাবীগণের প্রতি গালাগালিতে গড়ায়। শিয়ারা উচ্চ কণ্ঠে সাহাবীদিগকে গালিগালাজ করিতে থাকে, ফলে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং বহু প্রাণ হানি ঘটে। এই সকল কাণ্ডের মূলে ছিলেন খলীফা মুসতাযয়ীর (মৃত্যু ৫৭৫ হিজরী) প্রাইভেট সেক্রেটারী। খলীফা নাসেরের (৬২২ হিজরী) সময়ে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া যায়। তিনি রাফেযী শিয়া ছিলেন এবং ইমামীয়াগণের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন, তিনি ৫৮৩ হিজরীতে নিহত হন। [ইয়াফেয়ী (৩) ৪২৪ পৃষ্ঠা ; শযরাত (৪) ২৭৯ পৃষ্ঠা]।

৫৯৫ হিজরীতে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (মৃত্যু ৬০৬ হিজরী) হীরায় আগমন করেন এবং সুলতানের নিকট বিপুল সম্মানের অধিকারী হন। এই স্থানে কররামীয়াগণের নেতা তাপস প্রবর কাযী মজদুদ্দীন ইবনুল কদওয়ার সহিত ইমাম রাযী বিতর্কে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন। ইহার ফলে কররামীয়ারা চতুর্দিক হইতে আসিয়া শহরে সমবেত হন এবং শাফেয়ীগণের

সহিত লড়াই আরম্ভ করিয়া দেন। এই অরাজকতার নিবৃত্তি কল্পে সুলতানকে সেনাবাহিনী আহ্বান করিতে হয়। [ইয়াফেয়ী (৪) ৯ পৃষ্ঠা]।

৫৮৭ হিজরীতে মিসরে হাম্বলী ও শাফেয়ীগণের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং বহু লোক ক্ষয়ের পর ইহার বিরতি ঘটে। [ঐ (৩) ৪৩৪ পৃষ্ঠা]।

৬৫৫ হিজরীতে বাগদাদে শিয়া ও সুন্নীগণের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ ঘটে এবং ভয়াবহ লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকে। নগরের বহু স্থান বিধ্বস্ত হয়। [দুয়ালুল ইসলাম (২) ১২২ পৃষ্ঠা]।

মোটের উপর জাষ্টিস আমীর আলী সাহেবের ভাষায় এই সময়ে অর্থাৎ সপ্তম শতকের মধ্যবর্তী যুগে বাগদাদে শিয়া সুন্নী, হানাফী শাফেয়ী ও হানাফী হাম্বলীদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। এই সংগ্রামগুলি শুধু বাগদাদেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মহামারীর মত উহা ইসলাম জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আলমে ইসলামের প্রধানতম কেন্দ্র বাগদাদের পতন ও খেলাফতে ইসলামীয়ার বিলুপ্তি এবং মুসলিম সভ্যতার সাত শত বৎসরের বিরচিত সৌধের বিধ্বস্তি প্রকৃত প্রস্তাবে এই শিয়া সুন্নী আর দলপন্থীদের গৃহ যুদ্ধের ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল।

পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিশারদ বিদ্বানগণ সকলেই সমস্বরে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, চারি মযহবের অন্ধ অনুসারীগণের গোঁড়ামী, শিয়াদের স্বভাব সিদ্ধ ইসলাম বিদ্বেষ এবং মুক্ত বুদ্ধির অবলুপ্তি তাতারী রাক্ষসদিগকে মুসলিম সম্রাজ্যের নিধন কল্পে প্ররোচিত করিয়াছিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুজাদ্দিদ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তয়মিয়াহ তাতারী অভিযান সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে,

وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم فى المذاهب وغيرها حتى تجد المنتسب إلى الشافعى يتعصب لمذاهبه على مذهب أبى حنيفة حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه إلى مذهب الشافعى وغيره حتى يخرج من الدين: والمنتسب على أحمد يتعصب لمذهبه إلى مذهب هذا وهذا، وفى الغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا وهذا -

"প্রাচ্য দেশ সমূহে তাতারীগণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার কারণ হইতেছে, মযহব লইয়া ফিরকাপরস্তিগণের অতি মাত্রায় গোঁড়ামী ও দলাদলি। ইমাম শাফেয়ীর সহিত সম্পর্কিত দল স্বীয় মযহবের অন্ধ গোঁড়ামীর জন্য ইমাম আবু হানীফার সহিত সম্পর্কিত দলের উপর মহা বিদ্বিষ্ট, এমনকি তাঁহারা

হানাফীদিগকে দীনে ইসলাম হইতেই খারিজ করিয়া রাখিয়াছেন। আবার ইমাম আবু হানীফার সহিত সম্পর্কিত দলটিও স্বীয় মযহবের গোঁড়ামীর জন্য ইমাম শাফেয়ীর সহিত সম্পর্কিত দলের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে, এমনকি তাহাদিগকে হানাফীরা দীনে ইসলাম হইতেই খারিজ করিয়া রাখিয়াছে! পুনশ্চ ইমাম আহমদের সহিত সম্পর্কিত দলটিও অন্যান্য ফিরকার মুসলমানগণের সঙ্গে সমভাবে বিদ্বেষ পরায়ন? আবার পশ্চিম দেশ সমূহে ইমাম মালেকের সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিরা স্বীয় মযহবের ফিরকাবন্দী অন্ধ গোঁড়ামীর ফলে অপরাপর মযহব সমূহের লোকদের সহিত অনুরূপভাবে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে আর অপরাপর মযহব পন্থীদের বিদ্বেষও মালেকীদের প্রতি কিছুমাত্র কম নয়।" [রাসায়েলে কবরা, পঞ্চদশ রিসালা [২] ৩৫২ পৃঃ]।

ইমাম ইবনুল হানাফী [মৃঃ ৭৯২ হিঃ] তদীয় তম্বিহাত নামক হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থ হেদায়ার টীকায় লিখিয়াছেন,

ومن جملة أسباب تسليط الفرنج على بعض بلاد المغرب والتتر على بلاد الشرق كثرة التعصب والتفرق والفتن بينهم فى المذهب وكل ذلك من اتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى -

"পশ্চিম দেশসমূহে ফিরিঙ্গীদের, আর পূর্ব দেশ সমূহে তাতারীগণের মুসলিম রাজ্য সমূহে প্রতিষ্ঠা লাভ করার অন্যতম কারণ মযহব লইয়া দলপন্থীগণের বিদ্বেষ এবং কলহ বিবাদে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। এই সকল হৃদয়-বিদারক দুর্ঘটনার কারণ হইতেছে কল্পনার অনুসরণ এবং প্রবৃত্তির অর্চনা, অথচ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের কাছে সুস্পষ্ট হিদায়ত আসিয়া পড়িয়াছে।" [দরাসা-তুললবীব, ১২৬ পৃঃ]।

চতুর্দশ শতকের বিখ্যাত মনীষী ও কুরআনের ভাষ্যকার মিসরের আল্লামা সৈয়দ রশীদ রিযা হুসায়নী মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'যে তাতারী ফিতনার প্রচণ্ড আঘাতে ইসলামের ভিত্তি শুদ্ধ নড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার কারণ হানাফী ও শাফেয়ী বিদ্বেষ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, সুন্নী শিয়া ও খারেজী এমনকি স্বয়ং সুন্নীগণের ভিতরকার দলগুলি পরস্পর কলহ বিবাদে আত্মনিয়োগ করিয়া যে মহা অনর্থ ঘটাইয়াছে, আশ্আরী হাম্বলীর সাথে, হানাফী শাফেয়ীর সাথে আর হাম্বলী শাফেয়ীর সাথে যে সকল সংঘর্ষ বাঁধাইয়াছে, যদি তাহার বিবরণ তোমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পড়িয়া দেখ, তাহা হইলে আমার কথার সত্যতা তোমরা নিজেরাই উপলব্ধি করিবে যে, তাতারী অভিযান দ্বারা মুসলিম সাম্রাজ্য সমূহের বিধ্বস্তির প্রধানতম কারণ ছিল হানাফী ও শাফেয়ীদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ! তাতারীগণের আক্রমণের ফলে আর তাহার সংশোধন

হয় নাই। তাতারীগণের অভিযানকেই অনেকে ইয়াজুজ মাজুজের [HGog-Magog] অভ্যুদয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন" [মুহাবিরাৎ, ৫৬ পৃঃ]।

সৈয়দ সাহেব তাঁহার অমূল্য তফসীর "আল মানারে' লিখিয়াছেন যে, 'বাগদাদের ইতিহাস পাঠ কর- তাতারী অভিযানের দুর্ঘটনা, যাহার ফলে পৃথিবীতে মুসলিম গৌরবের ভিত্তি প্রকম্পিত হয় এবং মুসলিম সাম্রাজ্যগুলি বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহার অন্যতম কারণ ছিল হানাফী শাফেয়ী কলহ এবং খলীফার শিয়া মন্ত্রী ইবনুল আল্‌কামী। এই মন্ত্রী পুঙ্গব সুন্নীগণের নিধনকল্পে তাতারী নর-রাক্ষসদিগকে ৬৫৬ হিজরীতে খিলাফতে ইসলামীয়ার রাজধানী বাগদাদে ডাকিয়া আনে। কিন্তু তাতারীরা যখন বাগদাদকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করিয়াছিল তাহারা শিয়া অ-শিয়া সকলকেই নৃশংস ভাবে হত্যা করিতে পশ্চাদ পদ হয় নাই। ইবনুল আলকামীকে তাহার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য স্বয়ং হালাকু খাঁ তিরস্কার করিয়াছিল এবং ইবনুল আলকামী তাহার অভিশপ্ত জীবনের দুর্ভাবনায় অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।" [তফসীর [৩], ১০ পৃঃ]।

সাধক প্রবর শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব শা'রানী [৮৯৮-৯৭৩] হানাফী ও শাফেয়ীদের গৃহ বিবাদ সম্পর্কে এক চমৎকার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, যে হানাফী ও শাফেয়ীদের মধ্যে যাহাতে প্রতিপক্ষের সহিত তর্ক বিতর্ক ও দাঙ্গাহাঙ্গামা করার শক্তি কমিয়া না যায়, তজ্জন্য উভয় ফিরকার লোকেরা তাহাদের মওলবীগণের ফতওয়া সূত্রে রামাযান মাসে রোযা রাখিত না [মীযান [১] ৪৩ পৃঃ।]।

ঐতিহাসিক আফীফ ইয়াফেয়ী [মৃঃ ৭৬৮ হিঃ] ইসলাম জগতের তৎকালীন দুরাবস্থায় মর্মাহত হইয়া লিখিয়াছেন, 'হায় দুরদৃষ্ট! ইসলাম কি ভয়াবহ বিপদে আক্রান্ত হইয়াছে। এবং হানাফী-শাফেয়ী ও অনুরূপ কলহ সমূহের কি হৃদয়-বিদারক পরিণতি ঘটিয়াছে! প্রত্যেকটি দল যে মযহবের অনুসরণ করিয়া থাকে তাহার গোঁড়ামীতে অন্ধ হইয়া স্বীয় দলভুক্ত দুশ্চরিত্রদিগকে অকপট সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে, আর অন্য মযহবের যাহারা প্রকৃত সাধুসজ্জন, তাহাদের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দুষ্কার্যকে তাহারা সত্যপরায়ণতা ও সত্যের সহায়তা বলিয়া ধারণা করিতেছে।" কিন্তু আল্লাহ বলিয়াছেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া শক্তিমান হও এবং বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হইওনা [আলে ইমরান, ১০৩ আয়াত]। আল্লাহ আরও বলিয়াছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيَعًا، لَسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَيْئٍ

যে সকল ব্যক্তি তাহাদের দীনকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়াছে এবং নিজেরা বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, হে রাসূল [সঃ], তাহাদের কার্যকলাপের সহিত আপনার কোন সংশ্রব নাই [আল্‌ আনআম, ১৫৯]। ইয়াফেয়ী বলিতেছেন, "আমাদের যুগে এই মহা অনর্থ অধিকাংশ দেশে ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহার জন্য আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।"

বাগদাদের পতন কাহিনী

তাতারী নর-রাক্ষসদের সেনাপতি তিমুজেন ৬০১ হিজরীতে চেঙ্গীস খান উপাধি ধারণ করেন। ৬১৪ হিজরীতে তিনি খোওয়ার্যম অধিকার করিয়া লন এবং ৬২২ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চীনের মঙ্গোলিয়া হইতে উত্থিত হইয়া এই নর-রাক্ষসরা পঙ্গপালের মত ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রায় সমগ্র এশিয়াকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। চেঙ্গীস্ মধ্য-এশিয়ার উপরিভাগে খোওয়ার্যম বা খীবা পর্যন্ত হানা দিবার পর মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তর ভাগে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। চেঙ্গীসের সামাজ্য যখন তদীয় পৌত্রগণের মধ্যে বিভক্ত হয় তখন মধ্য এশিয়া ও তৎসংলগ্ন দেশগুলি হালাকু খাঁর ভাগে পড়ে কিন্তু হালাকু খানও তাঁহার নির্দিষ্ট সীমানার বাহিরে পা বাড়াইতে সাহসী হন নাই। দীর্ঘ ছয়শত বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত "খিলাফতে ইসলামীর" গৌরব ও প্রতাপের প্রভাব তখনও কাহারও হৃদয় হইতে অন্তর্নিহিত হয় নাই কিন্তু আকস্মিকভাবে এমন এক কাণ্ড মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিতর সংঘটিত হইল যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ভূমির রুদ্ধ দ্বার হালাকুর সম্মুখে আপনা আপনি খুলিয়া গেল। খোরাসানে বাগদাদের মত হানাফী ও শাফেয়ীদের ভিতর তুমুল সংঘর্ষ চলিতেছিল। তুস শহরের হানাফীরা শাফেয়ীদের জিদে পড়িয়া হালাকু খাঁকে আমন্ত্রণ করিল এবং নিজেরাই নগরের সিংহদ্বার তাতারী বাহিনীর জন্য মুক্ত করিয়া দিল কিন্তু তাতারীদের তরবারি যখন নিষ্কাষিত হইল তখন তাহারা শাফেয়ীদের সঙ্গে হানাফীদিগকেও রেহাই দিল না, হানাফী ও শাফেয়ী সকলকেই তাহারা তুল্য ভাবে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল। [তর্জুমানুল কুরআন [শরহে নহজুল বালাগত, ইবনে আবির হাদীদ [২] ৪৯৩ পৃষ্ঠা]।

খোরাসানের পতন বাগদাদ অভিযানের পথ মুক্ত করিয়া দিল। হালাকুর মন্ত্রী ছিলেন খাওয়াজা নসীরুদ্দিন তুসী [মৃঃ ৬৭২ হিজরী] আর বাগদাদের খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহর [৫৮৮-৬৫৬] মন্ত্রী ছিলেন ইবনুল আলকামী [মৃত্যু ৬৫৬ হিজরী]। উভয় মন্ত্রী অত্যন্ত গোঁড়া শিয়া এবং সুন্নীগণের প্রতি ভীষণ ভাবে বিদ্বিষ্ট ছিলেন। নসীরুদ্দীন তুসী ইতিপূর্বে আলমুৎ দুর্গে ইসমায়ীলী রাফেযীদের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার কুখ্যাত ইসলাম বিদ্বেষ হালাকুর নৈকট্য লাভের পক্ষে সহায়ক

হইয়াছিল। তাহাদের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনায় একদিকে যেমন হালাকু খাঁ বাগদাদ আক্রমণ করার জন্য বিরাট আকারে প্রস্তুত হইতেছিলেন, অন্যদিকে ইবনুল আলকামীর বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে বাগদাদে সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা কমাইয়া মাত্র দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যে পরিণত করা হইয়াছিল [ইবনে কসীর [১৩] ২০১ পৃষ্ঠা]। প্রফেসর ব্রাউন তবকাতে নাসেরীর বরাতে খলীফার মোট সৈন্য সংখ্যা ২ লক্ষ লিখিয়াছেন [Literary History of Persia [২] ৪৬১ পৃষ্ঠা]। ইবনে খল্লদুন লিখিয়াছেন, ইবনুল আলকামী তদীয়বন্ধু আরবলের সুলতান ইবনুস্ সালায়াকে লিখেন যাহাতে তিনি হালাকু খাঁকে বাগদাদ আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করেন। হালাকু আলমুৎ দুর্গ আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অব্যবহিত কাল পূর্বে ইবনুল আলকামীর এই পত্র তাঁহার হস্তগত হয় [ইবনে খল্লদুন [৫] ৫৪ পৃষ্ঠা]। ব্রাউন লিখিয়াছেন, বাগদাদ অভিযানে যে সকল ব্যক্তি হালাকুর সাহচর্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সিরাজের আবু বকর বিনে সঅদ জঙ্গী [শেখ সাদী যাহার নামে তদীয় গুলিস্তা নামক গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন], মসুলের বদরুদ্দীন লুলু তদীয় মন্ত্রী আতা মালিক জোওয়ায়নী এবং নসীরুদ্দীন তূসী প্রভৃতি [ব্রাউন [১] ৪৬০ পৃঃ]। মসুলের শাসনকর্তা লুলু হালাকুর জন্য অভিযানের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে গোপনে খলীফাকেও হালাকুর দুরভিসন্ধির কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইবনুল আলকামী সে কথা খলীফাকে আদৌ জ্ঞাপন করেন নাই। তিনি হালাকুর নিকট স্বীয় ভ্রাতা ও জনৈক ক্রীতদাসকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হালাকুর সহিত তাঁহার শর্ত হইয়াছিল যে, হালাকুর প্রতিনিধি স্বরূপ বাগদাদের সিংহাসনে তিনি স্বয়ং উপবেশন করিবেন। এই শর্ত মানিয়া লইলে বাগদাদ অধিকার করার জন্য হালাকুকে কোনরূপ বেগ পাইতে হইবে না বলিয়া ইবনুল আলকামী তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সমস্ত আয়োজন ঠিক ঠাক হওয়ার পর ইবনুল খোয়ার্যমীর পুত্র হালাকুর নিকট অর্থ, খাদ্য ও জানোয়ার সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়া লোক প্রেরণ করেন। মসুলের সুলতানের সঙ্গে তদীয় পুত্র সালেহ ইসমায়ীলও হালাকুর সহযাত্রী হইয়াছিলেন [ইবনুল ইমাম [৫] ২৭০ পৃষ্ঠা]। ইবনে কসীর, ইবনুল ইমাদ ও সৈয়ূতী প্রভৃতি তাতারী সৈন্যদলের সংখ্যা দুই লক্ষ বলিয়াছেন কিন্তু শিয়া ঐতিহাসিক ইবনে তবাতবা যিনি ইবনুত তিকতিকী নামে প্রসিদ্ধ [মৃঃ ৭০২ হিজরী] তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, তাতারী সৈন্য দলের সংখ্যা মাত্র ত্রিশ হাজার ছিল [ইবনে কসীর [১৩] ২০০ পৃষ্ঠা, ফখরী ৩০০ পৃষ্ঠা]। ব্রাউন এক লক্ষ দশ হাজার সৈনিকের কথা লিখিয়াছেন [Literary History of Persia [২] ৪৬১ পৃষ্ঠা]। হালাকুর সৈন্যদল কাঁচির আকারে দুই দিক দিয়া বাগদাদের উপর চড়াও করে। হালাকু স্বয়ং এক বিরাট বাহিনী লইয়া পূর্ব দিক দিয়া সোজাসুজি অগ্রসর হইতে থাকেন। আর এক দল বায়ুনয়ানের সেনাপতিত্বে পশ্চিম দিক হইতে বাগদাদের উপর চড়াও করার উদ্দেশ্যে-তক্রীতের পথ ধরিয়া আগুয়ান হইতে থাকে। খলীফার

পক্ষ হইতে হালাকুর প্রতিরোধকল্পে খলীফার সেক্রেটারী মুজাহেদুদ্দীন আইবেক, যিনি দওয়েদার সগীর নামে প্রসিদ্ধ তিনি এবং মালিক ইয়্যুদ্দীন বিনে ফতহুদ্দীন অগ্রসর হন এবং মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে হালাকুর অগণিত ধ্বংস বাহিনীর প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হন। কিন্তু রাত্রিযোগে তাতারীরা চৈনিক ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে দজলার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহার ফলে বাগদাদ নগরী প্লাবিত এবং খলীফার সৈন্য বাহিনী পরাভূত হয়।

দওয়েদার ও ইযযুদ্দীন প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়া খলীফাকে নৌকাপথে বসরায় পলায়ন করার পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতক ইবনুল আলকামী তাহাতেও বাধা প্রদান করিলেন [ব্রাউন [২] ৪৬১ ও ৪৬২ পৃষ্ঠা]।

যহবী ও ইবনুল ইমাদ লিখিয়াছেন, যে, হালাকুর সহিত সন্ধির কথা আলোচনা করিবেন এইরূপ ভান করিয়া ইবনুল আলকামী একক ভাবে হালাকুর সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু ইবনে কসীর তাঁহার ইতিহাসে বলিয়াছেন, যে, ইবনুল আলকামী স্বীয় পরিবার বর্গ ও দাস দাসী সমভিব্যবহারে হালাকুর নিকট গমন করিয়া ছিলেন এবং যাহাতে কোন ক্রমেই সন্ধি স্থাপিত হইতে না পারে খাওয়াজা নসীরুদ্দীন তূসীসহ তিনি হালাকুকে সেইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন [দুওয়ালুল ইসলাম [২] ১২২ পৃষ্ঠা; শযরাত [৫] ২৭১ পৃষ্ঠা; ইবনে কাসীর [১৩] ২০১ পৃষ্ঠা]।

যহবী ও ইবনুল ইমাদ লিখিয়াছেন, যে, ইবনুল আলকামী হালাকুর নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া খলীফা মুসতা'সিমকে বলিলেন, যে, হালাকু খাঁ সন্ধির জন্য সম্মতি দিয়াছেন এবং খলীফার পুত্র আমীর আবু বকর আহমদের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহে প্রস্তাব দিয়াছেন সন্ধির শর্ত এই যে, খলীফার পূর্বপুরুষগণ যেরূপ 'সলজুকী'দের অধীনতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন, খলীফাকেও তদ্রূপ হালাকুর অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইবনে কসীর বলিয়াছেন যে, সন্ধি শর্তের মধ্যে ইরাক প্রদেশের অর্ধেক রাজত্ব হালাকুকে প্রদান করিবার কথাও ইবনুল আলকামী খলীফাকে শুনাইয়াছিলেন। ইবনুল আলকামীর প্রস্তাব অনুসারে বিবাহোৎসব সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে খলীফা তাঁহার নিকট আত্মীয় এবং কাযী, মুফতী, সূফী ও নেতৃস্থানীয় উমারা এবং রাজপ্রতিনিধিগণের মোট সাত শত অশ্বারোহী সহ-হালাকুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত সাতশত বিশিষ্ট ও নির্বাচিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেককে হত্যা করা হইল। স্বয়ং খলীফার সহিত হালাকু খাঁ অতিশয় অপমান সূচক ব্যবহার করিলেন। খলীফা লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তিত হইলেন। খাওয়াজা নসীরুদ্দীন তূসী ও ইবনুল আল-কামী খলীফার সঙ্গে সঙ্গে বাগদাদে আসিলেন এবং তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে খলীফা রাজকোষের সমুদয় স্বর্ণ, হীরক এবং

মূল্যবান সামগ্রীসহ পুনরায় হালাকুর নিকট উপস্থিত হইলেন। ইবনে কসীর [১৩] ২১ পৃষ্ঠা]।

ঐতিহাসিক ইবনে কসীর লিখিয়াছেন যে, শিয়া মন্ত্রীদ্বয়ের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার ফলে খলীফা মুসতাসিমের শত অনুনয় বিনয় ও অনুরোধ সত্ত্বেও হালাকু তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। মন্ত্রীরা হালাকুকে বুঝাইয়াছিলেন যে, সন্ধি কদাচ স্থায়ী হইবে না এবং দুই এক বৎসর যাইতে না যাইতেই খলীফা বিদ্রোহ করিবেন। উক্ত দুই ইসলাম বিদ্বেষী শিয়া মন্ত্রীর উস্কানীর ফলেই শেষ পর্যন্ত হালাকু খলীফা মুসতা'সিমের প্রাণ ভিক্ষা দিতেও রাযী হইলেন না, ইসলাম জগতের খলীফাকে অতিশয় নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল। যহবী, ইবনে কসীর, ইবনুল ইমাদ, সৈয়ুতী প্রভৃতি লিখিয়াছেন যে, হিংস্র তাতারীগণ লাথি মারিতে মারিতে খলীফা মুসতা'সিমকে হত্যা করিয়াছিল। ইবনে খল্লদুন বলিয়াছেন, খলীফাকে চটের বস্তায় পুরিয়া কুঠার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল [ইবনে খল্লদুন [৫] ৫৪৩ পৃষ্ঠা]।

৬৫৬ হিজরীর ১২ই মুহাররম হালাকুর সৈন্য দল বাগদাদে প্রবেশ করে এবং ১৪ই সফর বুধবার-খলীফাতুল মুসলেমীন শহীদ হন। ইবনুত তিকতিকীর মতে শাহাদতের তারিখ ছিল ৪ঠা সফর। খলীফার দুই পুত্র আমীর আবু বকর আহমদ ও আবুল ফাযায়েল আবদুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া তাতারী নর-পিশাচের দল খলীফার কন্যা ও পুর-মহিলাগণকে দাসীতে পরিণত করে [ফখর ঃ ১ পৃষ্ঠা]।

প্রফেসার ব্রাউন লিখিয়াছেন যে, বাগদাদে তাতারীদের হত্যা উৎসব আট দিন পর্যন্ত চলিতে থাকে ও আট লক্ষ নাগরিক নিহত হয়। হালাকুর বাগদাদে প্রবেশের দিন হইতে খলীফার শাহাদত পর্যন্ত ৩৩ দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল কিন্তু ইবনে কসীর ও ইবনুল ইমাদ লিখিয়াছেন ৪০ দিবস আর যহবী বলিয়াছেন ৩৪ দিবস। দিবস এবং রাত্রির সকল সময় অবাধ ভাবে হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল। নিহতদের সংখ্যা ইবনে খল্লদুনের বর্ণনা সূত্রে তেইশ লক্ষ, যহবী ও ইবনুল ইমাদের কথাসূত্রে আটাশ লক্ষ, ইবনে কসীর, তাঁহার ইতিহাসে আট লক্ষ হইতে চল্লিশ লক্ষ পর্যন্ত বিভিন্নরূপ উক্তি উধৃত করিয়াছেন। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। যাহারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহকোণে লুকাইয়া ছিল দুয়ার ভাঙ্গিয়া অথবা গৃহে আগুন লাগাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। উচ্চ দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহের ছাদ হইতে নালী দিয়া রক্তের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। হযরত আব্বাসের বংশধরগণের সকল সন্তানকে কবরস্থানে সমবেত করিয়া ছাগলের মত যবেহ করা হইয়াছিল। খলীফার কনিষ্ঠ পুত্র মুবারক এবং তিন কন্যা ফাতিমা, খাদিজা ও মরিয়ম এবং রাজ প্রাসাদ হইতে সহস্রাধিক কুমারীকে নর পিশাচের দল দাস দাসীতে পরিণত করিয়া ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিল। পথে ঘাটে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পুরুষ মহিলাগণের সহিত নর পশু-তাতারী সৈন্য প্রকাশ্যভাবে বলাৎকার করিয়া বেড়াইতে ছিল। হত্যাকাণ্ড ও বলাৎকারে তাহারা শিয়া, সুন্নী ও হানাফী, শাফেয়ী কাহাকেও বাদ দেয় নাই। ইমাম ইবনে জওযীর পুত্র ইমাম মহীউদ্দীন ইউসুফ এবং তাঁহার তিন পুত্র

আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ও আবদুল করিম, মুজাহেদুদ্দীন আইবেক, শিহাবুদ্দীন আলী এবং সুন্নী উলামা, ফকীহ, মুহাদ্দেস, হাফিয ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে বাছিয়া বাছিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। সমস্ত নগর অগ্নিদগ্ধ, মসজিদ মাদরাসা, কলেজ ও খানকা প্রভৃতি শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। ছয় শতাব্দী ধরিয়া বাগদাদে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে অমূল্য গ্রন্থ ভাণ্ডার সঞ্চিত হইয়াছিল, তাতারী বর্বরের দল এক সপ্তাহের ভিতর সমস্তই দজলার বুকে ডুবাইয়া দিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। শেষ পরিণতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে কসীর লিখিয়াছেন, অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার ছিল যখন তাহা ঘটিয়া শেষ হইল এবং চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেল তখন ইসলাম জগতের কেন্দ্র মহানগরী বাগদাদ শুধু ধ্বংসস্তূপের আকারে অবশিষ্ট ছিল, কদাচিৎ লোক দৃষ্টিগোচর হইত। পথে ঘাটে শবদেহগুলি ঢিপির মত থাক লাগিয়া পতিত ছিল। বৃষ্টির দরুণ লাশগুলি পচিয়া আকাশ ও বাতাস দুর্গন্ধে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। বায়ু দূষিত হওয়ায় ভীষণ মড়ক দ্রুত বেগে বিস্তার লাভ করিতেছিল এবং সিরিয়া পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইরাক ও শামের অধিবাসীবৃন্দ একযোগে দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং মৃত্যুর কবরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। (ইবনে কসীর ২০২-২০৫ পৃষ্ঠা; শযরাত (৫) ২৭০ পৃষ্ঠা; ইবনে খলদুন (৫) ৫৪৩ পৃষ্ঠা ও দুওয়ালুল ইসলাম (২) ১২২ ও ১২৩ পৃষ্ঠা]।

প্রফেসর ব্রাউনের ভাষায় বাগদাদের পতন কাহিনী শেষ করিব ঃ "বাগদাদের লুণ্ঠন কার্য ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আরম্ভ হয় এবং সপ্তাহকাল চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে আট লক্ষ অধিবাসীকে হত্যা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে যে বাগদাদ মহানগরী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আব্বাসী খলীফাগণের বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল তাহার সমুদয় ধনসম্ভার এবং সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পদ যাহা-দীর্ঘকাল হইতে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল সমস্তই লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করা হয়। তাতারীদের দ্বারা মুসলিম সংস্কৃতির যে মহান সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল পরবর্তী যুগে তাহা কখনও পূরণ হইতে পারে নাই। এই ক্ষতির বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব এবং কল্পনার অতীত! কেবল যে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থরাজী সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়াছিল তা নয়, অগণিত বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর বিনাশ সাধন দ্বারা অথবা রিক্ত হস্তে শুধু প্রাণ লইয়া তাঁহাদের পলায়ন করার দরুণ মৌলিক গবেষণার পদ্ধতি এবং সঠিক রেওয়ায়তসমূহের সনদগুলি যাহা আরাবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় বিরাট ও মহান সভ্যতাকে এত শীঘ্র আগুনে ভস্মীভূত ও রক্তসমুদ্রে নিমজ্জিত করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না।"

বাগদাদের বাহিরে

তাতারী অভিযানের ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানগুলি কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহার মোটামুটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

"৬১৭-৬১৮ হিজরীতে নিম্নলিখিত দেশ ও নগরগুলি বিধ্বস্ত হয় ঃ সমরকন্দ, বুখারা, খোরাসান, খোওয়ারযম, রয়, হামদান, আযর বাইজান, দরবন্দ-শিরওয়ান, কযবীন, তবরেয, মরাগান, মরাগ, আরবল, সল্‌ফান, তিরমিয, বলখ, নাসা, নেশাপুর, মরও, হিরাত ও বামীয়ান।

৬২০-৬২১ হিজরীতে নিম্নলিখিত স্থানগুলি আক্রান্ত ও পুনরাক্রান্ত হয় ঃ

কিপচাপ, কুম, কাশান, তুরিষ, রয়,হামদান।

৬২৪ হিজরীতে ইসফাহান বিধ্বস্ত হয়। ৬২৮ হিজরীতে খোরাসান, আযরবাইজান ও মুরাগা পুনরাক্রান্ত হয় এবং মার্দীন ও আসআর্দের পতন ঘটে। ৬২৯ হিজরীতে শহরযোরের পতন হয়।

৬৩৩-৬৩৪ হিজরীতে নিম্নলিখিত নগরগুলি পুনরাক্রান্ত এবং নতুনভাবে আক্রান্ত হয় ঃ সমরকন্দ, শিরওয়ান, আবরন ও মসুল। ৬৩৪ হিজরীতে দরুকা বিজিত হয়।

৬৪১ হিজরীতে ইউরোপের কতকাংশ আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়। ৬৫০ হিজরীতে দেয়ারে বকরের নসিবয়েন ও সঞ্জার প্রভৃতি অধিকৃত হয়।

৬৫৫ হিজরীতে মসুল পুনরাক্রান্ত হয়।

৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের পতন হয়।

৬৫৭ হিজরীতে আরবল পুনরাক্রান্ত, মযাফার্কিন ও হাররান বিধ্বস্ত হয়।

৬৫৮-৬৫৯ হিজরীতে বিরা ও হলব অধিকৃত হয়।

৬৬০ হিজরীতে মসুল পুনরাক্রান্ত হয়।

ইসলাম জগতের বিধ্বস্তির উপরিউক্ত তালিকা হালাকুর মৃত্যু পর্যন্ত শেষ করা হইল। ৬৬২ হিজরীতে হালাকুর মৃত্যু ঘটে। যতগুলি স্থান তাতারীনর-রাক্ষস দল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল সমস্তগুলিই সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং নরনারী নির্বিশেষে সমুদয় অধিবাসী নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। খোওয়ার্যম শহরে বার লক্ষ মুসলিম নরনারীকে হত্যা করা হয়, ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত সাধক শায়খুল ইসলাম নাজিমুদ্দিন কুবরা অন্যতম। ৬২৮ হিজরীতে খোরাসানে জন প্রাণীর বসবাস করার উপায় ছিল না। নেশাপুরে নিহত অধিবাসীবর্গের মস্তক ছেদন করিয়া স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের মাথার খুলির পৃথক পৃথক তিনটি পিরামিড প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মরও নগরে তের লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়, যাহারা পলায়ন করিয়া বাঁচিয়াছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহাদিগকে নিঃশেষিত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিহতদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। বামীয়ান নগরীতে ১০০ বৎসর পর্যন্ত ঘাস জন্মিতে পারে নাই, সমস্ত শহর জনমানব শূন্য মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল।

আলাউদ্দীন আতা মালিক জুওয়ায়নী তাঁহার "জাহাঁকুশা" নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মুসলমান দেশ সমূহে হাজারে একজন লোকেরও প্রাণ রক্ষা হয় নাই।" [Brown's History (২) ৪৩৯ পৃঃ]।

জাতীয় জীবনের উল্লিখিত ভয়াবহ বিপর্যয় এবং সংকটের মূল কারণ ছিল মুসলমানদের গৃহ বিবাদ এবং এই গৃহ বিবাদের অন্যতম কারণ ছিল মযহবী কোন্দল এবং তকলীদপরস্তদের গোঁড়ামী ও বিদ্বেষ! দুঃখের বিষয় এত বড় আঘাতের পরও মুসলমানগণ সমবেতভাবে চৈতন্য লাভ করিতে পারেন নাই এবং ইহাই নিদারুণ পরিণতি স্বরূপ আজ তাতারী অভিযানের স্থানে নাস্তিকতা ও জড়বাদের যে সয়লাব সমগ্র ইসলাম জগতকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার প্রতিকার কল্পে মুসলমানগণ কুরআন ও সুন্নতের মর্মকেন্দ্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া জাতীয় জীবনকে সংহত ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে প্রস্তুত হইতেছেন না। والله المستعان

সমস্যা ও সমাধান পদ্ধতি

আজিকার মত ইসলামের প্রাথমিক যুগেও মুসলমানরা বিবিধ রূপে সমস্যার সম্মুখীন হইতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় কোন ব্যক্তি কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলে হযরতের (সা) নির্দেশই উহার সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট হইত। হযরতের (সা) নির্দেশই উহার সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট হইত। হযরতের (সা) জীবদ্দশায় তাঁহার মীমাংসা ও বিচারের অন্যথাচরণ করার কোন উপায় ছিল না কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) তিরোভাবের পর খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবা ও তাবেয়ীনের সুবর্ণ যুগ সমূহে নিত্যনৈমিত্তিক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাদির সমাধান কি পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হইত বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিয়া দেখিব।

(ক) প্রথম খলীফার যুগে

মইমুন বিনে মিহরান বলিতেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকট কোন বিচার উপস্থিত হইলে সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহর গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, যদি উক্ত প্রশ্নের সমাধান কুরআনে প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইলে তিনি তদনুসারে মীমাংসা করিয়া দিতেন। যদি কুরআনে না পাইতেন অথচ উক্ত বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ তাঁহার জানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি তদনুসারে আদেশ প্রদান করিতেন। যদি উদ্ভূত প্রশ্ন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশও তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকিত, তাহ হইলে তিনি বাহির হইয়া বেড়াইতেন ও বলিতেন, আমার সম্মুখে এই জটিল প্রশ্ন সমুপস্থিত হইয়াছে, আপনারা কি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন হাদীস অবগত আছেন? মইমুন বলিতেছেন, কখন কখন এমনও ঘটিত যে, সকলেই উক্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ অবগত থাকিতেন। তখন আবু বকর বলিতেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন লোকও বিদ্যমান রহিয়াছেন যাঁহারা আমাদের রাসূলের (সা) হাদীস স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন। মইমুন বলিতেছেন, জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সমাধান রাসূলুল্লাহর হাদীসেও যদি না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আবুবকর নেতৃস্থানীয় এবং সজ্জন ব্যক্তিদিগকে সমবেত করিয়া তাঁহাদের তিনি সমুপস্থিত সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেন। [দারমী ৩২ পৃঃ]।

জননী আয়েশা বলিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন অনন্তধামে যাত্রা করিলেন তখন আবু বকর মদীনার নিকটবর্তী সুনুহ নামক স্থানে স্বীয় বাসভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। হযরতের (সা) মৃত্যু শোকে দিশাহারা হইয়া হযরত উমর বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহর (সা) কিছুতেই মৃত্যু ঘটে নাই, তিনি মরিতে পারেন না। ইতিমধ্যে আবুবকর আসিয়া পড়িলেন ও

হযরতের (সা) গাত্র বস্ত্র উন্মোচন করিয়া তাঁহার পবিত্র দেহে চুম্বন দান করিলেন এবং বলিলেন, "আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসৃষ্ট হউন! জীবনে ও মরণে আপনি পবিত্রই থাকিয়া গেলেন!" তারপর ঘর হইতে বহির্গত হইয়া উপস্থিত জনসাধারণকে সম্বোধন করিলেন আবু বকরের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া উমর বসিয়া পড়িলেন। আবু বকর বলিলেন, আপনারা অবগত হউন, "যাহারা মুহাম্মদকে (সা) পূজা করিত তাহারা শ্রবণ করুক যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) সত্যই মরিয়া গিয়াছেন আর যাহারা আল্লাহর পূজারী তাহারা শ্রবণ করুক যে, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনও মরিবেন না।" অতঃপর আবু বকর কুরআনের নিম্নলিখিত আয়তটি পাঠ করিলেন ঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ - وقال : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّاكِرِيْنَ -

"তুমিও মরণশীল এবং তাহারাও মরণশীল" তারপর বলিলেন,

"মুহাম্মদ (সা) রাসূল ছাড়া অন্য কিছুই নহেন এবং তাঁহার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সকলেই অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছেন। মুহাম্মদ (সা) মরিয়া গেলে বা নিহত হইলে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? অথচ যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে বস্তুতঃ তাহারা আল্লাহর কিছুই ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদিগকে উপযুক্ত ভাবে পুরস্কৃত করিবেন।" [বুখারী, ফতহ্ সহ (৮) ১১১ পৃঃ]।

উল্লিখিত ঘটনার ভিতরে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রেম ও আসক্তি ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ এবং নবী-প্রেমের আতিশয্যের ফলেই হযরত উমর ফারুক রাসূলুল্লাহর (সা) মৃত্যুকে চাক্ষুষ করা সত্বেও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই কিন্তু তাঁহার সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিল কুরআন! মুসলমানদের প্রণয় ও প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা, শত্রুতা ও বৈরিভাব সমস্তকেই আল্লাহর গ্রন্থ এবং তদীয় নবীর সুন্নতের অধীনে রাখিতে হইবে। যদি এরূপ না হয় তাহা হইলে কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত পথে চলিয়া কোন ব্যক্তি, ওলী, দরবেশ, রাজনীতিবিদ ও অত্যাধুনিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে বটে-কিন্তু মুসলিমরূপে তাঁহাকে কিছুতেই মর্যাদা দান করা চলিবে না। উমর ফারুক কিভাবে স্বীয় অন্তর্নিহিত অনুরাগ ও শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি কুরআনের নির্দেশের পাদমূলে বিসর্জন দিয়াছিলেন এই ঘটনায় তাহা সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই বিষয়ে আল্লাহর রাসূলও (সা) জাতিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাবধান করিয়া গিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ -

"শুন! তোমরা কেহই ঈমানের অধিকারী হইতে পারিবেনা যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তিকে, আমি যাহা লইয়া আসিয়াছি (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ) তাহার অধীন করিতে সক্ষম হইবে।" (মুসলিম)

মা আয়েশা আরও বলিয়াছেন, যে রাসূলুল্লাহর (সা) পরলোক গমনের পর আনসারগণ সায়েদাদের চাতালে স'অদ বিনে উবাদার নিকট সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, আনসারদের মধ্য হইতে একজন আর মুহাজেরগণের মধ্য হইতে একজন সর্বাধিনায়ক বা শাসনকর্তা (আমীর) নির্বাচন করা হউক, তখন আবু বকর সিদ্দীক রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস তাঁহাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন যে,

الأئمة من قريش

"নেতা কুরায়েশ বংশোদ্ভূত হইবেন।" ইবনুত্তীন বলিতেছেন, আনসারগণ রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীস শ্রবণ করা মাত্র তাহা মান্য করিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজেদের দাবী প্রত্যাহার করিয়া ছিলেন- [বুখারী ফতহ্ সহ (৭) ২৫ পৃঃ]।

কুরায়শদের ইমাম সম্পর্কিত হাদীসটি সংবাদ, না আদেশের পর্যায়ভুক্ত এবং উক্ত আদেশ সার্বজনীন ও সর্বকালীন কি না এ বিষয়ে পরবর্তী বিদ্বানগণ যতই মাথা ঘামাইয়া থাকুন না কেন, ইহা সর্ববাদীসম্মত যে, এই হাদীসটি তখনকার মত একটি জাতীয় জীবনের বিধ্বস্তকারী মহা সংগ্রামের প্রতিরোধকল্পে অশেষ প্রকারে সহায়ক হইয়াছিল। আজ যাহারা রাষ্ট্র ক্ষেত্র হইতে রাসূলুল্লাহর (সা) সার্বভৌমত্ব চির সমাধিস্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাঁহারা স্বীয় ইসলামের ভনিতায় লজ্জা অনুভব করিতে পারেন কি?

যুয়বের পুত্র কুবায়সা বলিয়াছেন, যে, কোন ব্যক্তির পিতামহী হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকট আসিয়া মৃত পৌত্রের সম্পত্তিতে তাহার কি অংশ নির্ধারিত আছে তাহা জানিতে চায়। আবু বকর বলিলেন আল্লাহর গ্রন্থে তোমার অংশের কথা উল্লিখিত নাই আর এ সম্বন্ধে হাদীসের নির্দেশ কি তাহাও আমি অবগত নই। তুমি এখন ফিরিয়া যাও আমি লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব। অতঃপর আবু বকর সাহাবাগণকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উল্লিখিত প্রশ্নের কি মীমাংসা করিয়াছেন? মুগীরা বিনে শো'বা বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি পিতামহীকে পৌত্রের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ দান করিয়াছিলেন। আবু বকর বলিলেন, একথা আপনার মত আরও কেহ শুনিয়াছেন কি? তখন মুহাম্মদ বিনে মুসলিমা দাঁড়াইলেন এবং মুগীরার অনুরূপ কথা বলিলেন। তখন আবু বকর সেই ব্যবস্থা পিতামহীর জন্য বলবৎ করিয়া দিলেন, [মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ৩২৭ পৃঃ]।

এই ঘটনার ভিতর লক্ষ্য করা উচিত যে,হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাসূলুল্লাহর (সা) পরম মিত্র এবং স্বনামধন্য সহচর হওয়া সত্ত্বেও পিতামহী সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ অবগত হইতে পারেন নাই। অথচ এ কথা তাঁহার অপেক্ষা জুনিয়ার সাহাবীগণ অবগত ছিলেন। পরবর্তীকালে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ ইহাও বটে, অর্থাৎ একজন ইমামের নিকট যে হাদীসটি পৌছায় নাই অথবা উহার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয় নাই সেই হাদীসটি অপর ইমামের পক্ষে শ্রবণ করার সুযোগ ঘটিয়াছিল এবং তিনি যে মাধ্যমে উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাতে অবিশ্বস্ত কোন রাবী ছিল না। ফলে পরবর্তী ইমাম উল্লিখিত হাদীসটিকে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামের পক্ষে উহা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই। এক্ষণে মুসলমানদের ইতিকর্তব্য কি হইবে?

যে বিদ্বান উপরিউক্ত কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস অবগত হইতে না পারিয়া স্বীয় সাধারণ জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন মুসলমানদিগকে তাহারই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, না যে বিদ্বান রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস অনুসারে স্বীয় অভিমত সুসংবদ্ধ করিয়াছেন মুসলমানদিগকে তাহারই উক্তি মান্য করিতে হইবে?

আব্দুল্লাহ বিনে আব্বাস বলিতেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র দেহ কোথায় সমাধিস্থ করা হইবে সে সম্বন্ধে সাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ ঘটে। কেহ কেহ তাঁহার পবিত্র দেহ তাঁহার মসজিদেই দাফন করিতে চাহেন, আর অন্য একটি দল হুযুরকে (সা) তাঁহার সহচরবৃন্দের সহিত সাধারণ কবরস্তানে দাফন করিতে ইচ্ছা করেন। হযরত আবু বকর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছিলেন,

ماقبض نبى إلادفن حيث يقبض

"প্রত্যেক নবী যে স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেই স্থানেই তাঁহাকে দাফন করা হইয়া থাকে।" ইবনে আব্বাস বলেন যে, এই হাদীস শ্রবণ করার পর সাহাবাগণ দ্বিরুক্তি না করিয়া হযরত (সা) যে শয্যায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন তাহা উত্তোলন করিয়া উহার নিম্নস্থ ভূমিতে হযরতের (সা) পবিত্র রওযা খনন করিয়া ছিলেন- [ইবনে মাজা, ১১৮পৃষ্ঠা]।

জননী আয়শা বলেন, যে হযরত ফাতেমা ও হযরত আব্বাস [রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা ও চাচা] আবু বকর সিদ্দীকের নিকট আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহর (সা) পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দাবী করিলেন, তাঁহারা ফিদিকের বাগান আর খয়বরের জমির ভাগ চাহিতেছিলেন। আবু বকর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলিতে শুনিয়াছি,

نحن معاشر الانبياء لانورث، ماتوكنا صدقة ـ

"আমরা নবীর দল, আমাদের কেহ উত্তরাধিকারী হয় না, আমরা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাই সমস্তই সর্বসাধারণের জন্য।" -[বুখারী, ফারায়েয]।

আবু বকর সিদ্দীক বিবি ফাতেমাকে তাঁহার পিতার সম্পত্তির ভাগ প্রদান করেন নাই বলিয়া শিয়ারা আবু বকর, উমর এবং অন্যান্য সাহাবাগণের উপর খুব চটা কিন্তু আবু বকর সিদ্দীককে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের বশবর্তী হইয়াই বিবি ফাতেমার দাবী প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল। বিবি ফাতেমা ও হযরত আলীর রাসূলুল্লাহর (সা) এই নির্দেশটি অপরিজ্ঞাত ছিল এবং তাঁহারা কুরআনে বর্ণিত সাধারণ দায়ভাগের নিয়ম অনুযায়ী নিজেদিগকে রাসূলুল্লাহর (সা) পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বিবেচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের এই ইজতেহাদকে আবুবকর সিদ্দীক রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস দ্বারা খন্ডন করিয়াছিলেন। ফাতেমা ও আলীর ইজতেহাদ খন্ডন করার যোগ্যতা যদি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের ভিতর থাকে তাহা হইলে অন্যান্য উলামা, ফকীহ, মুহাদ্দিস, আওলিয়া ও রাষ্ট্র নীতিবিদগণের ব্যক্তিগত বা দলগত সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া দিবার ক্ষমতা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসকে প্রদান করা হইবে না কেন?

এই ঘটনার ভিতর আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য যে কুরআনের ব্যবস্থা সূত্রে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা কেতাবুল্লাহর অতিরিক্ত কোন হাদীস স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন, তাঁহাদিগকে আবু বকরের আচরণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত অথবা ১০/১২ জন সাহাবী ব্যতীত সমস্ত সাহাবীর ইজমা বাতিল এবং তাঁহাদের আচরণকে শিয়াদের মত গুমরাহী বলিয়া মান্য করিয়া লওয়া কর্তব্য।

মা আয়েশা বলিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) পরলোকগমনের পর হযরতের সহধর্মীনীগণ হযরত উসমানকে আবুবকর সিদ্দীকের নিকট প্রেরণ করিয়া রাসূলুল্লাহর (সা) পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দাবী করার সংকল্প করেন। মা আয়েশা তাঁহাদিগকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কি একথা বলিয়া যান নাই যে, আমাদের অর্থাৎ নবীগণের পরিত্যক্ত সম্পাত্তির কেহ উত্তরাধিকারী হয় না, সমস্তই জাতীয় সম্পদে পরিণত হইয়া থাকে?- [বুখারী, ফারায়েয]।

(খ) দ্বিতীয় খলীফার যুগে

মসরুক তাবেয়ী বলেন যে, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর একদা মিম্বরে আরোহন করিয়া জনমন্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, স্ত্রীলোকদের মোহরের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা যদি শুভকার্য হইত তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তদীয় সাহাবীগণ বর্ধিত পরিমাণে মোহর নির্ধারিত করিতেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে

কেহই চারি শত দিরহামের অতিরিক্ত মোহর স্বীয় স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেন নাই। অতএব অতঃপর যদি কেহ চারিশত দিরহমের অতিরিক্ত মোহর স্বীয় স্ত্রী বা কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করে তাহা হইলে অতিরিক্ত অর্থ আমি বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইব। মস্রুক বলেন, যে জনৈকা কুরায়শী মহিলা হযরত উমরের নির্দেশ শ্রবণ করিয়া বাধা প্রদান করিলেন এবং হযরত উমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমিরুল মুমেনীন, আপনি কি লোকদিগকে স্ত্রী লোকদের মোহর চারিশত দিরহামের অতিরিক্ত নির্ধারিত করিতে নিষেধ করিতেছেন? আপনি কি কুরআনের আয়ত শ্রবণ করেন নাই যে, আল্লাহ বলিয়াছেন,

وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا

"তোমরা যদি স্বীয় নারীদিগকে অর্থের স্তূপ মোহর-স্বরূপ দান কর"। মহিলাটির কথা শ্রবণ করিয়া হযরত উমর তৎক্ষণাৎ মসজিদে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পুনরায় মিম্বরে আরোহন করিয়া বলিলেন, "একজন পুরুষ ভুল বুঝিয়াছিল কিন্তু একজন নারী ঠিক বুঝিয়াছে। হে জনমণ্ডলী, আমি আপনাদিগকে চারিশত দিরহামের অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, আমি এক্ষণে আমার নির্দেশ প্রত্যাহার করিয়া লইতেছি এবং বলিতেছি যে, যাহার যেরূপ ইচ্ছা ও সামার্থ সে তদনুরূপ মোহর নির্ধারণ করিতে পারে।" [আবু ইয়োলা]

এই ঘটনার সাহায্যে তিনটি বিষয় অবিসম্বাদিত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে ঃ প্রথম, আইনের তাৎপর্য অনুধাবন করার যোগ্যতায় নর-নারী সম্পূর্ণ অভিন্ন। দ্বিতীয়, কোন রাষ্ট্রাধিনায়কের বা পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত কুরআনের বিপরীত হইলে ইসলামী রাষ্ট্রে উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না। তৃতীয়, সমুদয় বিদ্বান ও চিন্তাশীল মনীষীগণের অভিমত কুরআনের প্রতিকুল হইলে তাঁহাদের অভিমত পরিত্যাজ্য হইবে।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর কুফার চীফ জাষ্টিস কাযী সুরায়হকে যাহা লিখিয়াছিলেন সমস্যা ও তাহার সমাধান পদ্ধতির পক্ষে উহাকে ইসলামের বুনিয়াদী বিধানরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন, "আপনার নিকট কোন সমস্যা সমুপস্থিত হইলে আপনি আল্লাহর গ্রন্থ অনুসারে উহার নিস্পত্তি করিয়া দিবেন। সাবধান! মানুষের উক্তির দিকে আপনি আগ্রহান্বিত হইবেন না আর বিষয়টি যদি এরূপ হয় যাহার মীমাংসা আল্লাহর গ্রন্থে নাই তাহা হইলে আপনি রাসূলুল্লাহর হাদীসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন এবং তদনুসারে সমাগত সমস্যার সমাধান করিয়া দিন আর যদি বিষয়টির মীমাংসা আল্লাহর গ্রন্থের মত রাসূলের সুন্নতে খুঁজিয়া না পান তাহা হইলে (ইসলামী পার্লামেন্টে) মানুষেরা যে বিষয়েতে একমত হইয়াছেন আপনি তাহা গ্রহণ করুন আর যদি উপস্থাপিত

প্রশ্নের মীমাংসা আল্লাহর কিতাবে এবং তাঁহার নবীর সুন্নতে বিদ্যমান না থাকে এবং পূর্ববর্তীগণও কেহ সে বিষয়ে আলোচনা না করিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি দুইটির মধ্য হইতে একটি পথ নির্বাচন করিয়া লউন অর্থাৎ হয় আপনি আপনার ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির সাহায্য লইয়া অগ্রসর হউন, আর না হয় উহার মীমাংসায় ক্ষান্ত থাকুন। আমি কিন্তু আপনার পক্ষে ক্ষান্ত থাকাই মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করি। [দারমী]

আবদুল্লাহ বিনে উমর বলেন, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক মৃত্যু-শয্যায় নিজের মনে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, আমি যদি কাহাকেও আমার স্থলাভিষিক্ত করিয়া না যাই তাহা হইলে রাসূলুল্লাহও (সা) তো কাহাকেও স্থলাভিষিক্ত করিয়া জান নাই। আর যদি আমি কোন ব্যক্তিকে আমার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যাই তাহা হইলে আবু বকর স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। হযরত উমরের পুত্র বিখ্যাত তাপস ও বিদ্বান হযরত আবদুল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহর কসম! যখন পিতা রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকরের তুলনা করিলেন তখনই আমি বুঝিয়া ফেলিলাম যে, তিনি আবু বকর অথবা অন্য কাহারও খাতিরে রাসূলুল্লাহ (সা) রীতি পরিহার করিবেন না এবং কাহাকেও তিনি স্বীয় স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করিয়া যাইবেন না। [মুসলিম (২) ১২০ পৃঃ]।

যাহারা মনে করিয়া থাকেন যে, হযরত উমর সকল বিষয়ে তাঁহার পূর্ববর্তী শাসনকর্তা খলীফা আবু বকরের অন্ধ অনুসরণ করিয়া চলিতেন এই ঘটনায় তাঁহাদের চৈতন্য উদ্রিক্ত হওয়া উচিত। হযরত উমর তাঁহার খিলাফতের যুগে হযরত আবু বকরের বহু ব্যক্তিগত নির্দেশ অমান্য করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের (সা) সমকক্ষতায় কাহারও কোন নির্দেশ মুসলমানের কাছে যে গ্রহণ যোগ্য হইতে পারে না ইহা সামান্য চিন্তা করিলে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে জাতির সর্বাধিনায়ক নির্বাচন করার অধিকার ইসলাম জাতির হস্তেই প্রদান করিয়াছে এবং এই জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) আবশ্যক বিবেচনা করা সত্ত্বেও তাঁহার মহাপ্রয়াণের প্রাক্কালে স্পষ্ট ভাষায় কাহাকেও স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান নাই।

সঈদ বিনুল মুসাইয়েব বলেন, হযরত উমরের ব্যক্তিগত অভিমত অনুসারে স্ত্রীর পক্ষে তাহার স্বামীর দিয়ত অর্থাৎ আহত বা নিহত হওয়ার দরুন আর্থিক ক্ষতিপূরণের কোন অংশ প্রাপ্ত হইবার উপায় ছিল না কিন্তু যাহ্হাক বিনে সুফয়ান হযরত উমরকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আশ্ইয়স বিনুয যবাবির স্ত্রীকে তাহার স্বামীর দিয়তের দরুণ অর্থের অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা অবগত হওয়া মাত্র হযরত উমর ফারুক তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত প্রত্যাহার করিয়া লইলেন, [ইবনে মাজাহ, ১৯৪ পৃঃ]।

উমর ফারুক অগ্নিপূজকদের নিকট হইতে সামরিক ট্যাক্স গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহাদিগকে তিনি "আবাদাতুল আওসান" বা প্রতিমাপূজকদের পর্যায়ভুক্ত মনে করিতেন। অবশেষে আবদুর রহমান বিনে আওফ সাক্ষ্যদান করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরের অগ্নিপূজকদের নিকট সামরিক ট্যাক্স গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত উমর তাঁহার পূর্ব মত পরিহার করিয়া লইলেন।

আবু সঈদ খুদরী বলেন, যে, একদা আমি আনসারদের এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম এমন সময় আবু মূসা আশআরী অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, আমি উমরের নিকট গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করার জন্য তিনবার অনুমতি চাই এবং জওয়াব না পাওয়ায় ফিরিয়া আসি, ইতিমধ্যে হযরত উমরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটে এবং তিনি প্রত্যাবর্তনের কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি বলি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আদেশ করিয়াছেন ঃ

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُ كُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ .

"তোমাদের মধ্যে কেহ যদি কাহারও গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য তিনবার অনুমতি চাহিয়াও উত্তর না পায় তাহা হইলে সে ফিরিয়া আসিবে।" উমর বলিলেন, আল্লাহর কসম! আপনাকে এ কথার প্রমাণ দিতে হইবেই। আবু মূসা আনসারদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা কেহ হযরতের (সা) বাচনিক এই হাদীস শ্রবণ করিয়াছ কি? আবু সঈদ খুদরী বলেন যে, আমি দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ট ছিলাম, আমি আবু মুসা আশআরীর সহিত গমন করিয়া হযরত উমরের নিকট সাক্ষ্যদান করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বাস্তবিকই উক্ত কথা বলিয়াছিলেন। [বুখারী, ইসতিযান]।

এই ঘটনার সাহায্যেও প্রমাণিত হইতেছে যে, অপরের গৃহে প্রবেশ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসটি কনিষ্ট সাহাবীগণের জানা থাকিলেও উমরের ন্যায় প্রাচীন ও অগ্রগণ্য সাহাবীর উহা অপরিজ্ঞাত ছিল। যদি আবু বকর ও উমরের ন্যায় মহামনীষীদের কোন কোন হাদীস অজ্ঞাত থাকিতে পারে, তাহা হইলে পরবর্তী ইমাম ও ফকীহদের পক্ষে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন কোন নির্দেশ অপরিজ্ঞাত থাকা কিছু মাত্র বিস্ময়কর নয়। যাহারা মনে করেন যে, নির্দিষ্ট ইমাম বা ফকীহ রাসূলুল্লাহর (সা) সমুদয় আদেশ ও নিষেধ অবগত ছিলেন এবং শরীয়তের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অন্য বিদ্বান বা ফকীহর বিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করা আদৌ আবশ্যক নয় তাঁহাদের এই ধারণা একান্ত একদেশদর্শিতা ও গোড়ামীর পরিচায়ক মাত্র।

(গ) তৃতীয় খলীফার যুগে

স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রী যে কোন স্থানে থাকিয়া ইদ্দত পালন করিতে পারে বলিয়া হযরত উসমানের ধারণা ছিল। কিন্তু বিষয়টি মীমাংসার জন্য হযরত

উসমান আবু সাঈদ খুদরীর ভগ্নি ফোরায়'আকে ডাকাইয়া পাঠান এবং উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ফোরায়া হযরত উসমানকে জ্ঞাপন করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকিয়া ইদ্দত প্রতি পালন করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাহা অস্বীকার করেন অথচ আমার স্বামী তাহার পলাতক দাসের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার নিজস্ব ঘরবাড়ী বা সহায় সম্পদ কিছুই রাখিয়া যান নাই, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) সমস্ত অবগত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে বলিলেন, আল্লাহর গ্রন্থের নির্দিষ্ট মী'আদ পর্যন্ত স্বামীর গৃহে অবস্থান কর। অতঃপর হযরত উসমান স্বীয় অভিমত পরিবর্তন করিলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বলবৎ করিয়া দিলেন। [মুওয়াত্তা, ২১৭ পৃঃ]

আবু সামান বলেন, একদা আমি খলীফা উসমান গনীর নিকট উপস্থিত ছিলাম ইতিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে ওলীদ বিন উকবাকে ধরিয়া আনা হইল (ওলীদ এবং হযরত উসমান একই মাতার সন্তান ছিলেন এবং ওলীদ কুরায়শ গোষ্ঠির বিশিষ্ট ব্যক্তি, মহাবীর, কবি ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা), উমর ফারুক ও উসমান গণীর শাসনকালে বিভিন্ন স্থানের গভর্নর পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। ওলীদ ফজরের নামাযের দুই রাক্'আতে ইমামত করিয়া মুক্তাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমাদের জন্য কি আরও কিছু নামায পড়াইয়া দিব? দুই জন লোক হযরত উসমানের নিকটে সাক্ষ্যদান করিলেন যে, তাহারা ওলীদকে সূরা পান করিতে দেখিয়াছেন। আর এক ব্যক্তি বলিলেন, তিনি তাহাকে বমন করিতে দেখিয়াছেন।

হযরত উসমান বলিলেন, মদ না খাইলে ওলীদের বমনে সূরা ধরা পড়িত কেমন করিয়া? অতঃপর হযরত উসমান ওলীদকে সূরাপানের দণ্ড স্বরূপ বেত্রাঘাত করার জন্য হযরত আলীকে আদেশ দিলেন হযরত আলীর নির্দেশ ক্রমে তদীয় ভ্রাতুস্পুত্র আবদুল্লাহ বিনে জা'ফর ওলীদকে বেত্রাঘাত করিতে ও হযরত আলী তাহা গণনা করিতে লাগিলেন। চল্লিশ বেত লাগান হইলে হযরত আলী বলিলেন, ক্ষান্ত হও! রাসূলুল্লাহ (সা) মদ্য পানের দণ্ডস্বরূপ চল্লিশ বেত লাগাইয়া ছিলেন, আবু বকরও চল্লিশ বেত লাগাইয়াছিলেন কিন্তু উমর ফারুক আশি বেত লাগাইয়াছিলেন। সমস্তই সুন্নত বটে কিন্তু আমার কাছে চল্লিশ বেতের শাস্তিই উত্তম [সহীহ মুসলিম, (২) ১৭ পৃঃ]।

এই ব্যাপারে কয়েকটি গুরুতর বিষয় লক্ষ করা উচিত। ইসলামের সমাজ ব্যবস্থায় দেশের শাসনকর্তা ও সর্বসাধরণের মধ্যে আইনের প্রয়োগ ব্যবস্থায় কোনরূপ ব্যতিক্রম রাখা হয় নাই। ওলীদ একাধারে যেরূপ কুফার গবর্নর ছিলেন, সেইরূপ ইসলাম জগতের সর্বাধিনায়ক হযরত উসমান গণীর সহোদর ছিলেন, কিন্তু ইসলামী দণ্ডবিধির আওতা হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই এবং হযরত উসমানের পক্ষেও স্বজন প্রীতির কোন লক্ষণ প্রদর্শিত হয় নাই। ইসলামী রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্টকে তথাকথিত গণতন্ত্রবাদীর দলবিশেষ

আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, কারণ সাম্য ও গণতন্ত্রের ঢাক পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলি যত জোরেই বাজান না কেন ইসলামের সাম্য এবং ন্যায় বিচারের সঙ্গে তাহারা কোন দিন মুকাবিলা করিতে পারেন নাই এবং ভবিষ্যতেও ইহার কোন সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় বিষয়টি যাহা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত তাহা হইল এই যে, হযরত আলী-আবু বকর এবং উমরের দণ্ডবিধানকে ভ্রান্তিমূলক মনে না করিলেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দণ্ডবিধানকে অগ্রগণ্য করিয়াছিলেন।

চতুর্থ খলীফার যুগে ঃ

ইকরিমা বলেন, ইবনে সাবা ইহুদীর প্ররোচনায় শিয়াদের প্রথম যে দলটি ইসলাম ধর্ম বর্জন করিয়া হযরত আলীকে আল্লাহর অবতার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল হযরত আলী তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস বলেন, আমি যদি আলীর স্থানে হইতাম, তাহা হইলে ইসলাম ভ্রষ্টদিগকে অগ্নিদগ্ধ না করিয়া তরবারী দ্বারা নিহত করিতাম। কারণ রাসূলুল্লাহর (সা) বলিয়াছেন من بدل دينه فاقتلوه "ইসলাম গ্রহণ করার পর যদি কেহ ফিরিয়া যায় তাহাকে তরবারীর আঘাতে নিহত কর।" ইবনে আব্বাস পুনশ্চ বলিলেন, যে, আমি অপরাধিদিগকে কদাচ অগ্নিদগ্ধ করিয়া মারিতাম না। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহর দণ্ড দ্বারা কাহাকেও দণ্ডিত করিও না। হযরত আলী ইবনে আব্বাসের উক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ইবনে আব্বাস সত্য কথাই বলিয়াছেন [তিরমিযী (২), ৩৩৭ পৃঃ]।

আবদুল্লাহ বিনে উমরের পুত্র সালিম বলেন, যে, একদা আমি জনৈক সিরিয়াবাসীকে তামাত্তু হজ্জ (উমরা এবং হজ্জের মিলিত সঙ্কল্প) সম্পর্কে আমার পিতা আবদুল্লাহ বিনে উমরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে শুনিয়াছিলাম, ইব্‌নে উমর উত্তর করিয়াছিলেন যে, উহা হালাল! তাঁহার ফতওয়া শ্রবণ করিয়া সিরিয়ার লোকটি বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, আপনি হালাল বলিতেছেন বটে কিন্তু আপনার পিতা তামাত্তু হজ্জ নিষেধ করিতেন। ইবনে উমর বলিলেন, দেখ! যে কার্য আমার পিতা নিষেধ করিয়াছেন যদি তাহা রাসূলুল্লাহ (সা) করিয়া থাকেন তাহা হইলে তুমি বল সেরূপ ক্ষেত্রে আমার পিতার সিদ্ধান্ত মান্য করিতে হইবে, না রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে? লোকটি বলিলেন, এরূপ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশই অবশ্য প্রতিপালিত হইবে [তিরমিযী,- হজ্জ]।

হযরত আব্দুল্লাহ বিনে উমর একদা বিখ্যাত, তা'বেয়ী আবুশ্ শা'আসা জাবির বিনে যয়েদকে বলিলেন,

إنك من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية

তুমি বসরার ফকীহগণের অন্যতম, সাবধান! স্পষ্ট কুরআন এবং অতিক্রান্ত সুন্নত ছাড়া অন্য কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া ফত্ওয়া প্রদান করিওনা [দারমী, ৩৩ পৃ]।

হযরত মু'আয বিনে জবল বলেন, মুসলিমগণ! "তোমরা বিপদ অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই উহার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইও না, কারণ সাহাবীগণের চিরাচরিত প্রথা ছিল যে, কোন সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে, তাঁহারা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করিয়া শুনাইয়া দিতেন [দারমী, ২৩ পৃঃ]।

হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস যদি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইতেন তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত বিষয়টি কুরআনে উল্লিখিত থাকিলে তিনি কুরআনের নির্দেশ জানাইয়া দিতেন। কুরআনে না থাকিলে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস শুনাইয়া দিতেন। জিজ্ঞাসিত বিষয়টির মীমাংসা যদি কুরআন ও হাদীসে না থাকিত, তাহা হইলে তিনি হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের ফতওয়া শুনাইয়া দিতেন এবং ইহাও যদি সম্ভবপর না হইত তাহা হইলে তখন তিনি তাঁহার নিজের অভিমত ব্যক্ত করিতেন [দারমী, ৩৩ পৃষ্ঠা]।

আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস কর্তৃক আবু বকর ও উমরের ফত্ওয়া উল্লেখ করার তাৎপর্য এই নয় যে, তিনি তাঁহাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের অন্ধ অনুসরণ বা তকলীদ করিতেন। আবুবকর ও উমরের সমুদয় সিদ্ধান্ত ইসলামী পার্লামেন্টে গৃহীত সিদ্ধান্তের নামান্তর মাত্র, সুতরাং ইব্‌নে আব্বাসের আচরণ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও সুন্নতে যে বিষয়ের মীমাংসা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, সে সম্পর্কে মুসলমানদিগকে সাহাবীগণের ইজমার অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিনে মসউদ বলেন যে, কাহারও উপর বিচার-পতিত্বের ভার ন্যস্ত করা হইলে তাহাকে আল্লাহর গ্রন্থ অনুসারে বিচার করিতে হইবে। আর যাহা কুরআনে নাই তাহার মীমাংসা রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত অনুসারে করিতে হইবে এবং যে বিষয়ের মীমাংসা কুরআন এবং হাদীসে নাই তাহার ফয়সালা সাহাবীগণের মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে করিতে হইবে- [দারমী ৩ পৃঃ]।

আমীর মু'আবিয়া হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিয়া মদীনাতেও আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বরে আরোহন করিয়া বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, আমার বিবেচনায় সিরিয়া দেশের দুই মুদ্ (অর্ধ সা) গম এক স' খেজুরের সমতুল্য। সর্বসাধারণ শাসনকর্তার এই কথা মানিয়া লইলেন কিন্তু বিখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, আমি মু'আবিয়ার এই নির্দেশ মান্য করিব না, রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে যেভাবে ফিৎরা আদা করিতাম ঠিক সেই ভাবেই যাবজ্জীবন দিতে থাকিব এবং এক সা'র কম

কোন খাদ্য বস্তুরই ফিৎরা কদাচ বাহির করিব না [বুখারী ফতহসহ, (৬) ৬৪ পৃঃ]।

এই ঘটনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে শাসনকর্তাদের শরয়ী মসআলা সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত জনমণ্ডলীর জন্য প্রতিপালনীয় নয় এবং কাহারও ইজতেহাদ আইনের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না।

তাবেয়ীগণের যুগে

আমর বিনে দীনার তাবেয়ীকুল গৌরব সালেম বিনে আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত উমর হজ্জের সময় জমরার পর বায়তুল্লাহর যিয়ারতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ তাওয়াফে-ইফাযার পূর্বে সুগন্ধির ব্যবহার নিষেধ করিতেন। জননী আয়েশা বলিলেন, আমি স্বহস্তে রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র দেহে ইহ্‌রামের প্রাক্কালে ও হালাল হইবার সময় তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে সুগন্ধি মাখাইয়াছি।

সালিম বলিতেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত অনুসরণের অধিকতর যোগ্য। ইমাম শাফেয়ী বলিতেছেন, সালিম হযরত আয়িশার প্রমুখাৎ বর্ণিত রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের দরুণ স্বীয় পিতামহ ও ইসলাম জগতের সর্বাধিনায়ক উমর ফারুকের ফতওয়া বর্জন করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে হাফিয ইবনে আবদুল বর ও ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহাই প্রত্যেক মুসলিমের উপযোগী আচরণ। তকলীদপন্থীরা যেভাবে স্বীয় মান্যস্পদগণের খাতিরে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্জন করিয়া থাকেন, তাহা একজন মুসলিমের উপযোগী আচরণ নয়। (ইকায, ১১ পৃঃ)

তায়েবীকুল-ভূষণ আবু সালমা বসরায় পদার্পণ করিলে আবুন্নসর ইয়াহ্‌য়া বিনে আবি কাসির ও ইমাম হাসান বসরী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট গমন করেন। আবু সালমা হাসান বসরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তুমিই হাসান বসরী? এই নগরীতে তোমার অপেক্ষা অধিক অন্য কাহারও সাক্ষাৎকার আমার বাঞ্ছনীয় ছিল না। আমি শুনিয়াছি, তুমি নাকি নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া ফতওয়া দিয়া থাক, সাবধান! রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত এবং অবতীর্ণ কুরআন ব্যতিরেকে কখনই ফত্‌ওয়া দিওনা। (দারমী -৩৩ পৃঃ)

ইমাম আওযারী বলিতেছেন যে, পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ স্বনামধন্য তাবেয়ী ফকীহ্ উমর বিনে আবদুল আযীয ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন যে, আল্লাহর গ্রন্থের মুকাবেলায় কাহারও অভিমতের কোন মূল্য নাই কিন্তু যে বিষয়ে কুরআনে কিছু অবতীর্ণ হয় নাই এবং যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসেও কোন নির্দেশ বিদ্যমান নাই কেবলমাত্র সেই সব বিষয়ে ইমামগণের অভিমত মূল্যবান। যে

সুন্নত স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) বলবৎ করিয়া গিয়াছেন তাহার মুকাবিলায় যে কেহই হোক না কেন কাহারও অভিমত কার্যকরী নয়। (হুজ্জতুল্লাহেল বালেগা-১৫৫ পৃষ্ঠা)।

তাবেয়ী-কুলশ্রেষ্ঠ ইব্রাহীম নখয়ী এই অভিমত পোষণ করিতেন যে, দুই ব্যক্তি নামাযের জামাআতে দাঁড়াইলে মুক্তাদিকে ইমামের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইতে হইবে। আ'মশ বলেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) ইবনে আব্বাসকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড় করাইয়াছিলেন। ইব্রাহীম নখয়ী এই হাদীস শ্রবণ করা মাত্র স্বীয় অভিমত পরিবর্তন করিয়া ফেলিলেন- (দারমী, ৬২ পৃঃ)।

স্বনামধন্য তাবেয়ী আমের বিনে আবদুল্লাহ শা'বী বলিতেছেন, বিদ্বানগণ যাহা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়া শুনাইবেন, তোমরা তাহা গ্রহণ কর। কিন্তু তাহারা নিজেদের খেয়াল মত যে ব্যবস্থা প্রদান করিবেন তাহা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ কর।

আমরা এর্যাবৎ যে সকল উধৃতি পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ সম্পর্কে বিদ্বানগণের অভিমত ও আচরণের তাহার সামান্য মাত্র নিদর্শন। এই সকল উক্তির সাহায্যে দ্ব্যর্থহীন ভাবে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, সুবর্ণ যুগে মুসলমানদের সম্মুখে যে কোন পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার উদ্ভব হইত কুরআন ও হাদীসের সাহায্যেই সেই সকল সমস্যার সমাধান করিয়া লওয়া মুসলমানগণের চিরন্তন রীতি ছিল। বিদ্বানগণের গবেষণা ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বহুমূল্য হইলেও উহার প্রত্যেকটি কথা চিরন্তন ও সার্বকালিন নয়। যে দিবস হইতে মুসলমানরা তাহাদের ব্যক্তিগত মতামত ও সিদ্ধান্তকে আল্লাহর গ্রন্থ ও রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের তুল্য আসন প্রদান করিতে শুরু করিয়াছেন সেই দিন হইতেই মুসলমানগণের জাতীয় জীবনের বিধ্বস্তি এবং সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গীর অসামঞ্জস্য আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিন হইতেই মুসলমানরা এত দলে ও পথে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, আজ তাহাদিগকে কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সমবেত করার প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক হইতে পারিতেছেনা। ব্যক্তিগত ও দলীয় খোদাওন্দির প্রভাব হইতে উদ্ধার করিয়া মুসলিম সমাজকে কুরআন ও হাদীসের সনাতন ও শাশ্বত কেন্দ্রে ফিরাইয়া আনাই আহলে হাদীস আন্দোলনের লক্ষ্য।

وبالله التوفيق

সমস্যার সমাধান পদ্ধতি
ও
অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি

সমস্যার সমাধান সম্পর্কে মহামান্য খলীফা চতুষ্টয় এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের রীতি ও অভিমত উধৃত করিয়াছি। তায়েবী কুলাগ্রগণ্য প্রথম শতকের সর্বসম্মত মুজাদ্দিদ পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর বিনে আবদুল আযীয একদা জনগণকে সম্বোধন করিয়া সমস্যার সমাধান ও রাষ্ট্র বিভাগ প্রণয়ণের যে মূলনীতি (Basic Principle) ঘোষণা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই উধৃত করিব।

ইমরানের পুত্র উবায়দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা খলীফা উমর বিনে আবদুল আযীয মিম্বরে আরোহন করিয়া বক্তৃতা দান করিলেন, তিনি বলিলেন ঃ

يا أيها الناس إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيا ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذى أنزل عليه كتابا فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة وما حرم على لسانه فهو حرام ألى يوم القيامة، ألا وإنى لست بقاض ولكنى منفذ ولست بمبتدع ولكنى متبع.ولست بخير منكم غير انى أثقلكم حملا، ألا وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع فى معصية الله، ألا هل بلغت ـ

হে জনগণ, আপনাদের নবীর (সা) বিয়োগের পর আল্লাহ আর কোন নবী সৃষ্টি করিবেন না এবং কুরআনের পর অন্য কোন ঐশী-গ্রন্থও অবতীর্ণ হইবে না, অতএব আল্লাহ স্বীয় নবীর (সা) মধ্যস্থতায় যে সকল বস্তু হালাল করিয়াছেন সেগুলি কেয়ামত পর্যন্ত হালাল, আর যেগুলি হারাম করিয়াছেন, সে সমস্ত কেয়ামত পর্যন্ত হারাম। আপনারা শ্রবণ করুন, আমি আইন রচনাকারী নই, আমি আল্লাহ এবং নবীর (সা) আইন সমূহ বলবৎকারী মাত্র! আমি বেদআতীও (নতুন ধর্মের আবিষ্কারক) নই, আমি অনুসরণকারী। আমি আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরও নই, তবে আপনাদের স্কন্ধ অপেক্ষা আমার স্কন্ধের বোঝা বেশী। আপনারা ইহাও শ্রবণ করুন যে, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন বিষয়ে জনগণের আনুগত্য লাভ করার কোন অধিকার কোন সৃষ্টজীবেরই নাই। অতএব আপনারা অভিহিত হউন যে, যে কথা প্রকৃত সত্য আমি তাহা আপনাদের শুনাইয়া দিয়াছি- [দারমী, ৬৩পৃঃ]।

উমর বিনে আবদুল আযীয তাঁহার এই রাজ্য-শাসন শুধু মৌখিক ভাবে ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইমাম আওযায়ী সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র উমর বিনে আবদুল আযীয ফরমান প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, আল্লাহর গ্রন্থের সমকক্ষতায় কাহারও অভিমত বা সিদ্ধান্তের অবকাশ নাই। যে বিষয়ে কুরআনে কোন আদেশ অবতীর্ণ হয় নাই কেবল সেই সকল বিষয়েই ইমামগণের প্রতিপাদন বা কিয়াস বৈধ হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) যে সুন্নাত প্রচারিত করিয়াছে সে সম্পর্কে কাহারও অনুকূল বা প্রতিকূল অভিমতের কোন মূল্য নাই- [ঐ, ৬২ পৃঃ]

খলীফা উমর বিনে আবদুল আযীযের বাণী ও চার্টারের সাহায্যে কয়েকটি বিষয় দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রমাণিত হইতেছে ঃ -

১। ইসলাম শুধু ইবাদত সংক্রান্ত কতিপয় বিধানের সমষ্টি মাত্র নয়। সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসন শৃংখলার যাবতীয় বিধানের সন্ধান মুখ্য বা পরোক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

২। কোন বিদ্বান বা আইনজ্ঞের, এমন কি কোন রাষ্ট্রেরও ইসলামী সমাজ জীবনে বা শাসনব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নতের প্রতিকূল কোন ফতওয়া বা আইন রচনার কোন অধিকার নাই।

৩। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক কুরআন ও সুন্নতের বলবৎকারী শক্তি মাত্র। তাঁহারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শরীয়ত (সমাজ বা রাষ্ট্র বিধান) প্রণয়ন ও প্রবর্তনের অধিকারী নন।

৪। যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নতে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান নাই শুধু সেই সকল বিষয়েই বিদ্বান ও আইনজ্ঞগণের কুরআন ও সুন্নতকে ভিত্তি করিয়া গবেষণা ও প্রতিপাদন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া বৈধ হইবে। (৫) যে বিষয়গুলি কুরআন ও সন্নতের স্পষ্ট বিধানের প্রতিকূল, সেই সকল বিষয়ে বিদ্বান বা শাসন-কর্তাগণের কোন আদেশ কখনও অনুসরণীয় ও আইনের পর্যায়ভুক্ত হইবে না।

মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের রীতি

ব্যবহারিক শাস্ত্রে আহলে সুন্নতগণের মধ্যে যে সকল বিদ্বান বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইমাম চতুষ্টয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি মহামতি ইমাম চতুষ্টয় সমস্যার সমাধান সম্পর্কে যে পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চলিতেন তাঁহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মহামতি আবু হানীফা (রহঃ)

أعِد ذكر نعمان لنا أن ذكره ـ هو المسك كلما كررته يتضوع!

[আমাদের কাছে নু'মানের কথা আবার বল, কারণ তাঁহার আলোচনা মৃগনাভি সদৃশ, যতবার ঘর্ষণ করিবে সুগন্ধি ততই বিস্তৃতি লাভ করিবে।]

প্রসিদ্ধতম চারি ইমামের মধ্যে হযরত আবু হানীফা নু'মান বিনে সাবেত (রহ) বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তজ্জন্যই তিনি 'আল ইমামুল আ'যম' রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহর (সা) একাধিক সহচর জীবিত ছিলেন এবং কোন কোন সাহাবীর সহিত অতি শৈশবকালে তাঁহার সাক্ষাৎকারও সম্ভাবিত হইয়াছিল। সাহাবাগণের প্রমুখাৎ তাঁহার কোন রেওয়ায়ত বিশ্বস্তভাবে প্রমাণিত না হইলেও যে পবিত্র যুগে তিনি ধরাধামে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। তাঁহার ইমামে আ'যম রূপে আখ্যাত হওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ বটে।

ইমাম সাহেব ১৫০ হিজরীতে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। ইমাম আবু হানীফার নামে যে ব্যবহারিক শাস্ত্র 'হানাফী মযহব' রূপে কথিত, তাহার প্রত্যেকটি উক্তিকে ইমাম সাহেবের সিদ্ধান্ত বলিয়া বিদ্বানগণ কোন যুগেই স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, তাঁহার নামে প্রচলিত ব্যবহারিক শাস্ত্রের সহিত গোড়াগুড়ি হইতে আহলে-হাদীসগণের বিভিন্ন স্থলে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক ইবনে খলদুন (মৃঃ ৮০৮) তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ উপক্রমণিকাংশে (মুকাদ্দেমা) বলিতেছেন ঃ

انقسم الفقه فيهم الى طريقتين : طريقة أهل الراى والقياس، وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث ! وهم أهل الحجاز، وكان الحديث قليلا فى أهل العراق، فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الراى ومقدم جماعتهم الذى استقر المذهب فيه وفى أصحابه أبو حنيفة رحمه الله تعالى -

"বিদ্বানগণের ফিক্‌হ শাস্ত্র দুই ধারায় প্রবাহিত হয়। একটি হইল "আহলে রায় বা আহলে কিয়াসগণের পন্থা। ইরাকের অধিবাসীগণ এই পথের পথিক। ফিক্‌হ শাস্ত্রের দ্বিতীয় ধারাটি হইল <u>আহলে হাদীসগণের পন্থা</u>। হেজাযের অধিবাসীবৃন্দ এই পথের অনুসরণকারী। ইরাকীদের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস অল্পই ছিল, সুতরাং তাহাদের মধ্যে কিয়াসের (প্রতিপাদন প্রণালী) আধিক্য ঘটিয়াছিল। আর এই জন্যই তাহাদিগকে <u>আহলে রায়</u> বলা হইয়া থাকে। এই দলের অগ্রনায়ক, যিনি উল্লিখিত পদ্ধতিতে স্বীয় সহচরবৃন্দের মধ্যে তাঁহার মযহব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন ইমাম আবু হানীফা (রহ) [-২৪ পৃষ্ঠা]।

ভারত গুরু শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস বলিতেছেন,

ولم يكن عند أهل الراى من الأحاديث والآثار مايقدرون به على استنباط الفقه على الأصول التى اختارها أهل الحديث ، ولم تنشرح صدورهم للنظر فى أقول علماء البلدان وجمعها والبحث عنها وكانوا اعتقدوا فى المتهم أنهم فى الدرجة العليا من التحقيق

وكان قلوبهم أميل شئ إلى أصحابهم وكان عندهم من الفطانة والحدس وصرعة انتقال الذهن من شئى إلى شئى مايقدرون به على تخريج جواب المسائل على قول أصحابهم وكل ميسر لماخلق له وكل حزب بما لديهم فرحون،

আহলে রায়দের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস এবং সাহাবাগণের উক্তি প্রচুর পরিমাণে মওজুদ ছিল না বলিয়া **আহলে হাদীসগণের** অবলম্বিত নিয়মানুসারে ফিকহের মসআলাসমূহ প্রতিপাদিত করা তাহাদের পক্ষে সম্ভাবিত হয় নাই। অধিকন্তু বিভিন্ন নগর নগরীর বিদ্বানগণের উক্তিসমূহ ও তৎসমুদয়ের পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার **কার্যেও আহলে** রায়গণ বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন নাই। তাহারা তাঁহাদের নেতৃবর্গ সম্পর্কে ধারণা করিয়া বসিয়াছিলেন যে, জ্ঞান ও গবেষণায় তাঁহাদের আসন বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের অন্তর স্বীয় শিক্ষকদের অপরূপ শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ ছিল। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এবং একটি বিষয় হইতে অন্য একটি বিষয় অনুমান করার প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব তাহাদের মধ্যে অত্যধিক ছিল। এই সকল কারণে তাহারা স্বীয় গুরুগণের সিদ্ধান্ত ও উক্তিসমূহকেই ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করিতে পারিতেন। যে কার্যের জন্য যাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার পক্ষে সেই কার্যই সহজসাধ্য হয় এবং প্রত্যেক দলের নিকট যাহা রহিয়াছে তাহা লইয়াই তাহারা পরিতুষ্ট থাকে, [হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা, ১৫৭ পৃষ্ঠা]।

আহলে রায় ও আহলে হাদীস দলের প্রতিপাদন রীতির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করিয়াছেন, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় হযরত ইমাম আবু হানীফার বেলায় তাহা প্রতিপন্ন করা সহজ নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, ইমামে আ'যমকে সর্বতোভাবে আহলে রায়গণের পর্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত নয়।

উস্তায আবু মনসূর আবদুল কাহের বাগদাদী (মৃত্যু ৪২০ হিজরী) তদীয় "উসূলে দীন" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে,

أصل أبى حنيفة فى الكلام كاصول أصحاب الحديث إلا فى مسئلتين

মতবাদের দিক দিয়া ইমাম আবু হানীফার নীতি দুইটি মসআলা ছাড়া সকল বিষয়েই আহলে হাদীসগণের অনুরূপ [(১) ৩১২ পৃষ্ঠা]।

অর্থাৎ আল্লাহর তওহীদে উলুহিয়ত, তওহীদে রবুবীয়ত, গুণাবলী ও কার্যসমূহ, উপরের দিকে তাঁহার অবস্থান, মহিমান্বিত আরশে তাঁহার বিরাজিত হওয়া, সৃষ্টজীব-জগত হইতে তাঁহার পার্থক্য ও বিভিন্নতা, সর্ববিষয়ে তাঁহার অবগতি ও শক্তির বিদ্যমানতা এবং যদৃচ্ছ ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া এবং নবুওত ও রিসালত, আলমে গাইব ও পুনরুত্থান প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্য নবাবিষ্কৃত দলসমূহের বিপরীত ইমাম সাহেব আহলে হাদীসগণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই বলিয়া উস্তায আবু মনসূর ইঙ্গিত করিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দুইটি বিষয়ের পার্থক্য শাব্দিক পার্থক্য মাত্র। আমি ফিকহ-শাস্ত্রীয় পার্থক্যের সামঞ্জস্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে নীতিগত এই পার্থক্যের স্বরূপ উদঘাটন করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

প্রথম পার্থক্যের স্বরূপ

শায়খুল মশায়েখ সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (রহ) স্বীয় গ্রন্থে ইমাম আ'যমের শিষ্যবৃন্দকে মুর্জিয়ারূপে আখ্যাত করিয়াছেন- [১৫৮-সিদ্দীকী, লাহোর]। শায়খ জীলানীর (রহ) এই অভিমত অনেক লোকের পক্ষে বিভ্রান্তির কারণ হইয়াছে।

রিজাল শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ খুলাসায় হযরত আলীর পৌত্র ইমাম হাসান বিন মুহাম্মদ হানাফীয়াকে (মৃত ৯৫ হিঃ) মুর্জিয়া মতবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (-৮১ পৃঃ)। শহরস্তানীও তাঁহার মিলাল ওয়ান নহল গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু ইবনে কুতায়বা বলেন যে, বসরায় সর্ব প্রথম হাস্সান বিনে বিলাল মু'যানী এই মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ আবুস্ সল্ত সাম্মানকে মুর্জিয়া মতবাতের মন্ত্রগুরু রূপে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ১৫২ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

ফলকথা, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম হাসান বিনে মুহাম্মদ হানাফীয়া অথবা হাস্সান বিনে বিলাল মু'যানী কিম্বা আবুস্ সল্ত সাম্মান ইহাদের মধ্যে যে কেহই মুর্জিয়া মতবাদের স্রষ্টা হউন না কেন, ইহাদের পরিগৃহীত ও প্রচারিত ইর্জা সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটি বিরাট বিভ্রান্তি সংঘটিত হইয়াছে।

আভিধানিকভাবে ইর্জার দুই প্রকার অর্থ প্রতিপন্ন হয়। প্রথম, বিলম্বিত করা, দ্বিতীয়, আশ্বস্ত করা। দুই অর্থকে ভিত্তি করিয়া নিম্ন লিখিত চারটি মতবাদের জন্য ইর্জা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

(১) আমলকে ঈমান অপেক্ষা বিলম্বিত করা।

(২) হযরত আলীর খেলাফতকে প্রথম স্থান হইতে চতুর্থ স্থানে বিলম্বিত করা।

(৩) কবীরা গুনাহর অপরাধীদিগের চূড়ান্ত মীমাংসা কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করা অর্থাৎ তাহারা বেহেশতী হইবে, না দোযখী- পার্থিব জীবনে তাহা নির্দিষ্টরূপে উচ্চারণ না করা।

(৪) ঈমানের সঙ্গে গুনাহকে ক্ষতির কারণ বিবেচনা না করা এবং শুধু ঈমানের বিনিময়ে পূর্ণ মুক্তি অর্জিত হইবে বলিয়া আশ্বস্ত করা।

যে সকল মুর্জিয়া চতুর্থ মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন, বিদ্বানগণ শুধু তাহাদিগকেই বিদআতী এবং সাহাবীগণের পরিগৃহীত পথের বিরোধী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম হাসান বিনে মুহাম্মদ হানাফীয়া ও ইমাম আবু

হানীফা নু'মান বিনে সাবেত এই উল্লিখিত চতুর্থ শ্রেণীর ইর্জার সমর্থনে একটি কথাও উচারণ করিয়াছেন কি?

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেয ইবনে হজর আসকালানী ইমাম হাসান বিনে মুহাম্মদ সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, আমি ইমাম সাহেবের বিরচিত গ্রন্থ স্বয়ং পাঠ করিয়াছি। এই গ্রন্থে তিনি কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ কল্পে ওসীয়ত করার পর লিখিয়াছেন যে, আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারুককে অন্ত রের সহিত ভালবাসি এবং তাঁহাদের সমর্থনে আমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকি। কারণ এই উম্মত উল্লিখিত দুই জন সম্পর্কে কখনও পরস্পর সংগ্রাম করেন নাই এবং এই উম্মতে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বা ইতস্ততের ভাবও সৃষ্টি হয় নাই। এই দুই জনের পর যাহারা ফিৎনায় (আত্মকলহে) প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় আমরা বিলম্বিত করিতেছি।"

হাফেয ইবনে হজর বলেন, যে, ইমাম হাসান বিনে মুহাম্মদের উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুসলমানদের যে দুইটি দল আত্ম কলহ ও সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ দলটি ভ্রান্ত আর কোন্ পক্ষ সত্য পথের পথিক ছিলেন ইহা নিদিষ্টরূপে উচ্চারণ করা তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি ঐ দুইটি দলের পরিণাম কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করিয়াছেন। কিন্তু আমল-বিহীন ঈমান যে মুক্তির পথে যথেষ্ট- এরূপ ইর্জা তিনি সমর্থন করেন নাই। অতএব হাসান বিনে মুহাম্মদ হানাফীয়ার মুর্জিয়া হওয়া কোন মারাত্মক ব্যাপার নয় [তহ্যীবুত তহ্যীব (২) ৩২১ পৃঃ]।

আমি বলিতে চাই যে, মুর্জিয়াদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে আহলে সুন্নত মুর্জিয়া ও বেদআতী মুর্জিয়া। ইমাম হাসান বিনে মুহাম্মদ হানাফীয়া ও ইমাম আবু হানাফীকে যদি একান্তই কেহ মুর্জিয়া বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আহলে সুন্নত মুর্জিয়ারূপে আখ্যাত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল! ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে আমার এই দাবী অতঃপর আমি প্রতিপন্ন করিব।

ভারতগুরু শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী তদীয় "তফ্হিমাতে ইলাহিয়া' নামক গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফার দলভুক্তগণের মুর্জিয়া হওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে উৎকৃষ্ট জওয়াব প্রদান করিয়াছেন, আমি সর্বপ্রথম তাহাই উল্লেখ করিব। উধৃতির দীর্ঘতা নিবন্ধন এ স্থলে শুধু অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

শাহ্ সাহেব লিখিয়াছেন-ইর্জা দুই প্রকার ঃ এক প্রকার ইর্জা এই নীতির অনুসরণকারীকে সুন্নত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং দ্বিতীয় প্রকার ইর্জা সুন্নতের বিরোধী নয়। প্রথম শ্রেণীর ইর্জার সারাংশ এই যে, মুখে স্বীকার করিয়া এবং অন্তরে মানিয়া লইলে কোন প্রকার পাপ বা ক্ষতির কারণ হইবে না। দ্বিতীয় প্রকার ইর্জার তাৎপর্য এই যে, আচরণ বা আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও

উহার জন্য পুরস্কার বা তিরস্কার ভোগ করিতে হইবেই। প্রথমোক্ত ইর্জার গুমরাহী হওয়া সম্বন্ধে সাহাবা ও তাবেয়ীগণ একমত হইয়াছেন এবং তাঁহারা সর্বসম্মতভাবে বলিয়াছেন যে, আমলের জন্য পুরস্কার বা দণ্ড লাভ করিতেই হইবে। অতএব সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত মতবাদের বিরোধীগণ নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত ও বিদ্আতী।

"কিন্তু আমল ঈমানের অঙ্গীভূত কিনা সে সম্পর্কে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ইজমা সংঘটিত হয় নাই। এরূপ অনেক আয়াত, হাদীস ও সাহাবীগণের উক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে যেগুলির সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, আমল ঈমান হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। আবার এরূপ আয়াত, হাদীস ও উক্তিরও অভাব নাই যেগুলির সাহায্যে প্রতিপন্ন করা যায় যে, বিশ্বাস উক্তি ও আচরণের সমষ্টিকেই ঈমান বলা হইয়াছে।"

হযরত শাহ্ সাহেব লিখিয়াছেন, "এই বিতর্কটি শাব্দিক মাত্র। কারণ সমুদয় আহ্‌লে সুন্নত একমত হইয়াছেন যে, কোন গোনাহ্গার স্বীয় পাপাচরণের জন্য ঈমান হইতে বাহির হইয়া যায় না, অথচ সে স্বীয় পাপাচরণের জন্য দণ্ডনীয় হইবে.এরূপ ক্ষেত্রে অতি অল্প চেষ্টাতেই ইহা প্রতিপন্ন করা সম্ভব যে, সকল প্রকার সদাচরণ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।"

শাহ্ সাহেব আরও বলিয়াছেন, "হযরত ইমাম আবু হানীফা দ্বিতীয় প্রকার ইর্জার সমর্থক এবং এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তিনি স্বয়ং জবরদস্ত আহ্‌লে সুন্নাত এবং সুন্নাতপন্থীগণের ইমাম। অবশ্য তাহার মযহাব যাহারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন মতবাদের দিক দিয়া তাঁহাদের ভিতর জুব্বায়ী, আবু হাশেম ও জমখশরীর মু'তাযিলারাও রহিয়াছেন, আবার তাহার দলে গস্সানের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ বিদ্আতী মুর্জিয়ারও অভাব নাই। ইহারা সকলেই ফিক্হ শাস্ত্রের দিক দিয়া ইমাম আবু হানীফার দলভুক্ত হইলেও মতবাদের দিক দিয়া কেহই তাঁহার অনুসরণকারী নহেন, অথচ তাঁহারা স্ব স্ব অলীক মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারণাকল্পে ইমামে আযমের নাম লইয়া থাকেন। ইমাম তাহাবী প্রভৃতি বিশ্বস্ত হানাফী বিদ্বানগণ ইমাম সাহেবের নামে এরূপ বহু মিথ্যা অপপ্রচারণা খণ্ডন করিয়াছেন। [(১) ২৮ পৃঃ]

আল্লামা শহরস্তানীও মিলল ওয়ান নহলে 'এইরূপ কথাই' বলিয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন-

ومن العجب أن غسان كان يحكى أن أبى حنيفة رحمه الله مثل مذهبه ويعده من المرجئة ولعله كذب ولعمرى كان يقال لأبى حنيفة وأصحابه مرجئة أهل السنة وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة -

"বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, মুর্জিয়াদের অন্যতম দল গস্‌সানীগণের পুরোহিত গস্‌সানও ইমাম আবু হানীফার নামে স্বীয় মযহবের অনুকূল তাঁহার উক্তি উধৃত করিতেন এবং তাঁহাকে মুর্জিয়াগণের অন্তর্ভুক্ত বলিতেন। কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা! আমার পরমায়ুর শপথ! ইমাম আবু হানীফা ও তাঁহার সহচরদিগকে আহলে সুন্নত মুর্জিয়া বলা হইত এবং মতবাদের ইতিবৃত্ত যাহারা প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই ইমাম সাহেবকে মুর্জিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন- [(১) ১৪৯পৃঃ]।

ইর্জার অভিযোগ এবং খণ্ডন সম্পর্কে অমি এ যাবত যে সকল উধৃতি পেশ করিয়াছি সেগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, আহলে হাদীসগণ আমলকে যেরূপ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করেন, সেইরূপ আবার কোন আমলের জন্য কাহাকেও ঈমান হইতে বহিষ্কৃত করেন না। ইমামে আ'যম আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে না করিলেও আমলের জন্য আহলে হাদীসগণের মতই পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছেন এবং আহলে হাদীসদের মতই তিনিও কোন পাপের কারণে কাহাকেও ঈমান হইতে খারেজ করেন নাই। এইরূপ অবস্থায় যতই চেঁচামেচি করা হউক না কেন, ইমাম সাহেবের ও আহলে হাদীস মতবাদের পার্থক্যকে শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া কি বলা যাইতে পারিবে?

দ্বিতীয় পার্থক্যের স্বরূপ

ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ গ্রন্থে কিতাবুল ঈমানের সূচনায় বলিতেছেন ঃ

باب ـ قول النبى صلى الله عليه وسلم : بنى الإسلام على خمس
وهو قول وفعل يزيد وينقص - :

"রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশের অধ্যায় যে, ইসলাম পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহা উক্তি ও আচরণের সমষ্টি এবং উহা বর্ধিত ও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। হাফেয ইবনে হজর বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সাহাবা ও তাবেয়ীগণ অর্থাৎ সকলের অভিমত এই যে, আন্তরিক বিশ্বাস, রসনার সাক্ষ্য এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আচরণকে ঈমান বলে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ উমদাতুল কারীতে লিখিয়াছেন,

إن الإيمان اقرار باللسان ومعرفة بالقلب وهو قول ابى حنيفة
وعامة الفقهاء وبعض المتكلمين .

রসনার দ্বারা স্বীকৃতি এবং অন্তরের পরিচয়ের নাম ঈমান। ইহাই ইমাম আবু হানীফা এবং ফকীহগণের ও কতিপয় মুতকল্লিমের উক্তি- [(১)১২১ পৃঃ]।

ইমামে আ'যম আমলকে ঈমানের পর্যায়ভুক্ত করেন নাই অথচ আহলে হাদীসগণ আমলকেও ঈমানের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে এর পার্থক্য পর্বত পরিমাণ দৃশ্যমান হইলেও ইমাম সাহেব এ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন মনোযোগ সহকারে তাহা অনুধাবন করিলে পর্বতের মুষিক প্রসব অনুমিত অর্থাৎ পর্বত পরিমাণ মতভেদ শাব্দিক পার্থক্যে পর্যবসিত হইবে।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ) এ সম্পর্কে বলিতেছেন যে,

ولا نقول أن المؤمن لايضره الذنوب وأنه لايدخل النار ولأنه
يخلد فيها، وإن كان فل سقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا، ولانقول
إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة ولكن نقول من
عمل حسنة بشرائطها خالية عن العيوب المفسدة والمعانى المبطلة
(كالكفر والعجب والرياء) ولم يبطلها حتى خرج من الدنيا فإن الله
تعالى لا يضيعها، بل يقبلها منه ويثيبه عليها، وما كان من السئات
دون الشرك والكفرولم يتب عنها حتى مات مؤمنا، فإنه فى مشية
الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفاعنه، ولم يعذبه بالنار أبدا.

আমরা একথা বলি না যে, মু'মিনের জন্য পাপাচরণ ক্ষতিকারক হয় না এবং আমরা একথাও বলিনা যে, মু'মিন আদৌ দোযখে প্রবেশ করিবে না এবং আমরা একথাও বলি না যে, গোনাহগার মু'মিনের দোযখ চিরন্তনী হইবে, যদি সে ফাসেকও হয় কিন্তু মু'মিন অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এবং আমরা মুর্জিয়াদের মত একথাও বলি না যে, আমাদের যাবতীয় পুণ্যকার্য গ্রাহ্য এবং আমাদের পাপরাজি মার্জনীয় হইবে। আমরা এই কথাই বলি যে, যে ব্যক্তি কোন সৎকার্য করিবে এবং উক্ত কার্য যথা নিয়মে এবং সর্বপ্রকার দোষমুক্ত ভাবে সম্পাদন করিবে এবং কুফর, অহঙ্কার ও কপটাচরণ দ্বারা উহা কলুষিত করিবে না এবং সেই অবস্থায় পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, আল্লাহ তাহার পুণ্যকার্য বিনষ্ট করিবেন না। বরং গ্রহণ করিবেন এবং তজ্জন্য তাহাকে পুরস্কার দিবেন। শির্ক এবং কুফর ছাড়া অন্যান্য পাপাচরণে লিপ্ত ব্যক্তি যদি তওবা না করিয়া মু'মিন অবস্থায় মরিয়া যায় তাহার পরিণাম আল্লাহর অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে তাহাকে ক্ষমাও করিতে পারেন। কিন্তু তাহাকে অনন্তকাল ধরিয়া কিছুতেই দোযখের শাস্তি প্রদান করিবেন না। [ফিক্‌হে আকবর, (মুল্লা আলী কারীর টীকাসহ) ৯৪ পৃঃ]

ইমামে আ'যমের উপরিউক্ত অভিমত যাঁহারা সুস্থ মনে অনুধাবন করিতে সক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বুঝিতে পারা আদৌ কষ্টকর নয় যে, তিনি তাঁহার অভিমত দ্বারা শুধু মু'তাযেলা এবং খারেজীদের মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই বরং মুর্জিয়াদের নাম লইয়া তিনি তাহাদের আকীদার প্রতিও স্বীয়

অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইমাম সাহেব স্বয়ং মুর্জিয়াদের নাম লইয়া তাহাদের মতবাদের খন্ডন করিতেছেন অথচ একদল লোক তাঁহকে মুর্জিয়া রূপে উল্লেখ করিয়াছেন কেন, ইহা বাস্তবিকই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। যে ব্যক্তি কোন দলের নাম লইয়া তাহাদের প্রতিবাদ করেন, তাঁহাকে শুধু শুধু সেই দলের অন্ত র্ভুক্ত করিতে যাওয়া গোঁড়ামী আর বাড়াবাড়ির পরিচায়ক নয় কি? হযরত ইমাম আ'যম ঈমান ও আচরণ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, উহার সমস্তই কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবা এবং ধর্মনিষ্ঠ তাবেয়ীগণ ঈমান ও আমল সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন। তাঁহারা সকলেই ইমাম সাহেবের মত আমলের জন্য পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা স্বীকার করিতেন। তাঁহারা সকলেই মুক্তির জন্য ইমাম সাহেবের মত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সূত্রে সদাচরণকে নির্ভরযোগ্য মনে করিতেন এবং পাপাচরণকে দন্ডের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন আর অপরাধীদের ক্ষমা এবং দণ্ডের ফয়সালা আল্লাহর পবিত্র হস্তেই সমর্পণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন।

অবশ্য একথা সত্য যে, ইমাম সাহেব ঈমানকে অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন এবং ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাসকে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই কথার দ্বারা তিনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহাও অনুধাবন করা কর্তব্য।

উল্লিখিত "ফিকহে আকবর" গ্রন্থেই কথিত হইয়াছে যে,

لايزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به نفسه، لامن جهة اليقين فإن مراتب أهلها مختلفة فى كمال الدين والمؤمنون مستون فى الإيمان والتوحيد متفاضلون فى الأعمال، والاسلام هو التسليم والانقياد لأوامر لله تعالى ففى طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام ولكن لايكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا ايمان فهما كالظهر مع البطن والدين اسم واقع على الايمان والإسلام والشرائع كلها۔

অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে ঈমান স্থাপন করা আবশ্যক সেই সকল বিষয়ের দিক দিয়া ঈমান বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু বিশ্বাসের দৃঢ়তার দিক দিয়া ঈমান বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ দীনের পরিপক্কতার দিক দিয়া ঈমানদারগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সমুদয় মু'মিন ঈমান ও তাওহীদের দিক দিয়া সমতুল্য কিন্তু আমলের দিক দিয়া সমতুল্য নয়। আর আল্লাহর আদেশ সমূহের সম্মুখে নতশির হওয়া এবং সেগুলি প্রতিপালন করাকে ইসলাম বলে। অতএব অভিধানের দিক দিয়া ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে কিন্তু কোন ঈমানই ইসলাম ছাড়া এবং কোন ইসলামই ঈমান ছাড়া হয় না। এই দুইটির পারস্পরিক সম্পর্ক পিঠ ও পেটের সম্পর্কের ন্যায়। আর দীন শব্দটি

ঈমান, ইসলাম ও শরীয়তের উপর সমষ্টিগত ভাবে প্রযোজ্য হইয়া থাকে। [১০৩-১০৪ পৃঃ]।

ফলকথা আহলে হাদীসগণ বলেন, যে আমল এবং ঈমান অভিন্ন। আর ইমাম সাহেবের অভিমত এই যে, আচরণ ছাড়া ঈমান আর ঈমান ব্যতীত আচরণ স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজিত হইতে পারে না। এক্ষণে এই উভয়বিধ বাক্যের মধ্যে কি পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বিদ্বানগণ বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

সমুদয় শরীয়তের বিধান যে শরয়ী ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, ইহাই সঠিক কথা। এ সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ হানাফী মুহাদ্দেস ইমাম তাহাবী ইমামে আ'যমের যে ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়াই আমি এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। তাহাবী স্বীয় "আকীদা" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইমাম হাম্মাদ বিনে যায়দ একদা ইমামে আ'যমকে রাসূলুল্লাহর (সা) বিখ্যাত হাদীস "কোন ইসলাম সর্বাপেক্ষা উত্তম"? (اى الأسلام أفضل؟) শুনাইতেছিলেন। ইমাম হাম্মাদ বিনে যায়দ ইমাম আবু হানীফাকে বলিলেন,

ألا ترى يقول أى الإسلام أفضل؟ قال الإيمان ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان فسكت أبو حنيفة رضى الله عنه، فقال بعض أصحابه الاتجيبه يا ابا حنيفة؟ قال بما أجيبه وهو يحدثنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, জিজ্ঞাসাকারী রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করিতেছেন, কোন ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট? তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেছেন, যে, উৎকৃষ্টতম ইসলাম হইতেছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরত এবং জেহাদকেও ঈমানের পর্যায়ভুক্ত করিলেন। এই হাদীস শ্রবণ করিয়া হযরত ইমাম মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে বলিলেন, জনাব আপনি ইহার উত্তর দিতেছেন না কেন? ইমাম সাহেব বলিলেন, আমি উহার কথার কি উত্তর দিব? সেত আমার কাছে রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীস বর্ণনা করিতেছে।] শরহে তাহাবীয়া, ২৮১ পৃঃ]।

এই ঘটনা দ্বারা দুইটি বিষয় অবিসম্বাদিত রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রথমটি এই যে, ইমাম সাহেব শরয়ী আমলগুলিকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং আমলকে ঈমানের বহির্ভূত তিনি শুধু আভিধানিক দিক দিয়াই মনে করিতেন। আর একথার সত্যতা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। এই ঘটনা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ইমামে আ'যম রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীসকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন এবং হাদীসের মুকাবেলায় কোনরূপ তর্ক বিতর্কের অবতারণাকে কিরূপ অসঙ্গত বিবেচনা করিতেন। সমস্যার সমাধানকল্পে হাদীসের গুরুত্ব কতখানি, ইমাম সাহেবের এই ঘটনার দ্বারা তাহাও পরিদৃষ্ট হইতেছে।

আমি এই নিরস বিষয়টির আলোচনা ইচ্ছা করিয়াই একটু দীর্ঘ করিয়া ফেলিয়াছি, কারণ সকল যুগেই ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। হাফেয ইবনে হজর আসকালানী স্বীয় তাহ্যীবুত তাহযীব নামক চরিতাভিধানে ইমাম সাহেব সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে,

الناس فى أبى حنيفة حاسد و جاهل ـ

"ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে কতকগুলি লোক বিদ্বেষের আশ্রয় লইয়াছে আর কতকগুলি লোক মুর্খতার পথ অবলম্বন করিয়াছে।" অর্থাৎ একদল লোক হিংসার বশবর্তী হইয়া তাঁহার মহান আসনকে খাট করিবার অপচেষ্টা পাইয়াছে আর একদল মুর্খতার বশবর্তী হইয়াছে ইমাম সাহেবকে তাঁহার সত্যিকার আসন হইতে ঠেলিয়া উঁচু করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে হাফিয যাহবীর ভাষায় ইমাম আবু হানীফা (রহ) মুসলিম জাতির ধর্মগুরু, একান্ত ধর্মনিষ্ঠ, অতি পরহেযগার, আলেমে বা-আমল, যবরদস্ত আবেদ এবং মহাবিদ্যান ছিলেন। কোন সরকারী পুরস্কার বা ভাতা জীবনে গ্রহণ করেন নাই, ব্যবসা দ্বারা স্বীয় জীবিকা নির্বাহ করিতেন [তয্কিরাতুল হুফফায (১) ১৫১ পৃঃ]। এহেন ব্যক্তির সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতার সহিত কোন কথা উচ্চারণ করা কর্তব্য, এবং ইহাই আমার এই শ্রম স্বীকার করার অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যবহারিক শাস্ত্র সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ইমাম সাহেব যে নীতি স্বয়ং অবলম্বন করিতেন এবং স্বীয় শিষ্যবৃন্দকে অবলম্বন করিবার নির্দেশ দিতেন তাহা অতঃপর আলোচিত হইবে।

و الله الهادى إلى سبيل الرشاد

ইমাম আ'যমের উক্তি

হাফিয ইবনে আবদুর রব সনদ সহকারে বর্ণনা দিয়াছেন যে, ইমাম সাহেব বলিয়াছেন,

ما جاء نا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والعينين، وما جاء نا عن أصحابه رحمهم الله اخترنا منه ولم نخرج عن قولهم، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال ـ

রাসূলুল্লাহ (সা) নিকট হইতে যাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা আমরা মস্তক ও চক্ষুদ্বয়ের উপর ধারণ করিয়া কবুল করিয়াছি আর আল্লাহর রাসূলের (সা) সাহাবীগণের যেসব কথা আমাদের নিকট পৌছিয়াছে তাহার মধ্য হইতে আমরা বাছাই করিয়া যে উক্তি উত্তম বিবেচিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁহাদের সকলের সিদ্ধান্তের বাহিরে যাই নাই। অর্থাৎ কোন না কোন

সাহাবীর উক্তি গ্রহণ করিয়াছি। সাহাবীগণের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করি নাই কিন্তু তাবেয়ীগণের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এই যে, তাঁহারাও মানুষ আর আমারও মানুষ। অর্থাৎ কোন তায়েবীর নিজস্ব অভিমতকে আমাদের ব্যক্তিগত অভিমতের উর্ধে স্থান দান করা আমরা আবশ্যক মনে করিনা [আলইনতাকা ঃ ১৪৪ পৃঃ]।

ইমাম সাহেবের অনুরূপ উক্তি হাফিয বয়হাকী তদীয় মদ্খল গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিনুল মুবারকের বাচনিক সহীহ সনদ সহকারে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। এবং এই রেওয়ায়ত মওলানা শায়খ আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী তাঁহার 'যফরুল আমানী' নামক পুস্তকে আর আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ বিন ইসমাইল ইয়ামানী তদীয় "ইরশাদ" গ্রন্থে উধৃত করিয়াছেন [ইরশাদুন নক্কাদ, ২৬ পৃঃ]।

হাফিয ইবনে হজর আসকালানী ইয়াহ্ইয়া বিনে যরীসের প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, আমি একদা হযরত সুফয়ান সওরীর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি ইমাম আবু হানীফার ভিতর কি দোষ দেখিতে পাইয়াছেন? সুফয়ান বলিলেন, কেন? তিনি কি? (প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আ'যমের সহযোগী বিদ্বানগণের মধ্যে যাহারা তাঁহার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন, হযরত সুফয়ান সওরী তাহাদের অন্যতম। সহযোগীদের প্রতি এই উষ্মা হইতে পৃথিবীর কোন বিদ্বান কোন কালেই রেহাই পান নাই)। আগন্তুক ব্যক্তি বলিলেন, আমি ইমাম আবু হানীফাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে কোন সমস্যা হউক না কেন উহার সমাধানকল্পে আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর গ্রন্থ কুরআনের আশ্রয় লইয়া থাকি, কুরআনে উহার সমাধান প্রাপ্ত না হইলে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নত অনুসন্ধান করি, সুন্নতেও উহার সমাধান না পাইলে সাহাবাগণের মধ্য হইতে যে কোন জনের উক্তি আমার মনঃপূত বিবেচিত হয়, আমি তাহা বাছিয়া লই কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাহাদের সকলের উক্তি পরিহার করিয়া অন্যদিকে গমন করি না কিন্তু ব্যাপার যখন ইব্রাহীম নখয়ী, শা'বী, মুহাম্মদ বিনে সিরীন অথবা আতা বিনে আবি রিবাহ পর্যন্ত গড়ায় তখন আমি তাঁহাদের মধ্য হইতে কাহারও অনুসরণ করিনা, কারণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত তাঁহাদের ইজতেহাদ মাত্র এবং তাঁহারা যেরূপ ইজতেহাদ করিয়াছেন আমিও সেইরূপ করিতে সক্ষম [তাহযীবুত তাহযীব (১০) ৪৫১ পৃঃ। শয়খ আবদুল ওয়াহ্হাব মা'রানী ইমাম আ'যমের এই উক্তি উধৃত করিয়াছেন ঃ

إذ رأيتم كلامنا يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فاعملوا بالكتاب و السنة واضربوا بكلامنا الحائط ـ

"তোমরা যদি আমার কোন উক্তি প্রকাশ্য কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিকূল দেখিতে পাও তাহা হইলে তোমরা কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ পালন করিও এবং

আমার উক্তি প্রাচীরের উপর ফেলিয়া মারিও।" [মীযানে কুব্‌রা (১) ৫৭ পৃঃ]। "ফাতাওয়ায় শামীয়া" নামক ফিক্‌হ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইমাম সাহেব বলিয়াছেন,

اذا صح الحديث فهو مذهبي -

"কোন সমস্যা সম্বন্ধে সহীহ হাদীসে যে সমধান পাওয়া যাইবে, তাহাকেই তোমরা আমার মযহব বলিয়া জানিবে।" গ্রন্থকার ইবনে আবেদীন বলিতেছেন যে, এই রেওয়ায়ত সঠিক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। [রদ্দুল মুহ্‌তার (১) ৪৬২ পৃঃ, ময়মনীয়া']।

আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ হায়াত সিন্ধী তাঁহার 'তুহ্‌ফাতুলআনাম' নামক পুস্তকে এবং আল্লামা শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস স্বীয় ইকদুর জীদ নামক পুস্তিকায় রওযাতুল উলামা গ্রন্থে বরাত দিয়া লিখিয়াছেন যে,

لن الإمام أبا حنيفة سئل : إذا قلت قولا وقولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقيل له : إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال : اتركوا قولى لقول الصحابة رضى الله عنهم -

ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার কোন সিদ্ধান্ত রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশের বিপরীত হইলে আমরা কি করিব ? ইমাম সাহেব বলিলেন, আল্লাহর রাসূলের (সা) হাদীসের মুকাবেলায় আমার উক্তি ফেলিয়া দিও। পুনশ্চ তিনি জিজ্ঞাসিত হইলেন, আপনার কোন অভিমত সাহাবাগণের সিদ্ধান্তের বিপরীত হইলে কি করিতে হইবে? তিনি বলিলেন- সাহাবাগণের উক্তির প্রতিকূল আমার কথা প্রত্যাখান করিও [ইরশাদ, ২৬ পৃঃ, ইকদুলজীদ, ৫৪ পৃঃ]।

ফাতাওয়ায় বায্‌যাযিয়ার সংকলয়িতা শায়খ হাফেযুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে শিহাব (মৃঃ ৮২৭ হিঃ) মনাকিবুর ইমাম গ্রন্থে ইমাম হাসান বিনে যিয়াদের বাচনিক ইমামে আ'যমের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص من كتاب الله تعالى أو سنة أو أجماع أمة، فإذا اختلفت الصحابة على أقوال نختار منها ماهو أقرب للكتاب والسنة ونجتهد ماجاوز ذلك -

কুরআন অথবা সুন্নাহ অথবা উম্মতের ইজমার সুস্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় ব্যক্তিগত অভিমত প্রয়োগ করিয়া কথা বলার অধিকার নাই। রসূলুল্লাহর (সা) সহচরগণের অভিমত কোন বিষয়ে বিভিন্নমুখী হইলে, তন্মধ্যে যে উক্তি কুরআন ও সুন্নাহর নিকটতর আমরা তাহাই বাছাই

করিয়া গ্রহণ করি এবং কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার বহির্ভূত বিষয় সমূহে ইজতেহাদ প্রয়োগ করিয়া থাকি। [মনাকিব (১) ১৪৫পৃঃ]

শয়খ মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী তাঁহার ফতুহাতে মক্কীয়াহ গ্রন্থে সনদ সহকারে ইমাম সাহেবের উক্তি রেওয়ায়াত করিয়াছেন যে,

إيَّا كم والقول فى دين الله بالرأى، وعليكم باتباع السنة، فمن خرج عنها ضل -

সাবধান! আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করিয়া কোন কথা বলিও না। সকল অবস্থাতেই সুন্নাতের অনুসরণ করিও, যে ব্যক্তি সুন্নাতের নির্ধারিত সীমা লংঘন করিবে সে বিপথগামী হইবে [মীযানে কুব্‌রা (১) ৯ পৃঃ]।

ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিপক্ষগণের বড় অভিযোগ এই যে, তিনি হাদীস গ্রাহ্য করিতেন না। পরবর্তী কালে হানাফী মযহবের যে দশাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, হযরত ইমামে আ'যমের বিরুদ্ধে হাদীস অগ্রাহ্য করার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আল্লামা ইবনে আবেদীন ইকদুর জওয়াহের গ্রন্থের উল্লেখে স্বীয় ফতাওয়ায় ইমাম সাহেবের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে,

الحديث الضعيف أحب إلىّ من أراء الرجال -

"বিদ্বানগণের ব্যক্তিগত অভিমতের তুলনায় আমার কাছে দুর্বল হাদীসও অধিকতর প্রিয়।

হাফিয ইবনুল কাইয়েম এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে,

وأصحاب أبى حنيفة رحمه الله يجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس و الرأى -

'ইমাম আবু হানিফার ছাত্রমন্ডলী ও অনুসরণকারীগণ এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, ইমাম আবু হানীফার মযহবে কিয়াস ও রায় অপেক্ষা দুর্বল হাদীস অনুসরণের অধিকতর যোগ্য।" তাঁহার মযহবের এই সূত্র অনুসারে হি হি করিয়া হাস্য করার হাদীস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও উহাকে রায় ও কিয়াসের অগ্রগণ্য করা হইয়াছে। প্রবাস কালীন খেজুরের রস দ্বারা ওযু করার হাদীসকে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও রায় ও কিয়াসের অগ্রণী করা হইয়াছে। এইরূপ দশ দিরহামের কম চুরির জন্য হাত কাটা নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও উহাকে রায় ও কিয়াসের অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। নারীর ঋতুবতী থাকার সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ মুদ্দত দশ দিন হওয়া এবং জুমুআর জন্য শহর হওয়ার শর্তের হাদীসগুলি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও রায় ও কিয়াসের উর্ধে স্থান লাভ করিয়াছে। কূপের মসআলা সংক্রান্ত হাদীসগুলি মর্ফু না হইলেও উহাদের জন্য কিয়াস পরিত্যক্ত হইয়াছে। ফল কথা,

রায় ও কিয়াসের মুকাবেলায় যয়ীফ হাদীস এবং সাহাবীগণের উক্তি অগ্রগণ্য করাই ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলের মযহব।

প্রকাশ থাকে যে, পরবর্তী যুগে বিদ্বানগণ যয়ীফ হাদীস বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের পরিভাষায় তাহা যয়ীফ নহে। পূর্ববর্তীগণ যে সকল হাদীসকে যয়ীফ বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছিলেন পরবর্তীগণের কাছে সেগুলি হাসান হাদীসরূপে কীর্তিত হইয়াছে। হাফিয ইবনুল কাইয়েম বলেন, "ফলকথা, কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত সিদ্ধান্ত ও অভিমতকে নিন্দা করার কার্যে পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ সকলেই একমত হইয়াছেন এবং তাঁহারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত সিদ্ধান্ত ও অভিমত ফতওয়া এবং বিচার কার্যে প্রয়োগ করা কোন ক্রমেই হালাল হইবে না। অবশ্য যে সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল কোন নির্দেশ কুরআন ও সুন্নাতে বিদ্যমান নাই, বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাহা অনুসরণ করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কোন ক্রমেই অবশ্য প্রতিপালনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না এবং যে ব্যক্তি উহা অস্বীকার করিবে, সে কোনক্রমেই নিন্দনীয় হইবে না"। [ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন (১) ৮৮ ও ৮৯পৃঃ]।

আমাদের যুগের হানাফী মযহবে যদি কেহ কিয়াস ও ইসতিহসানের বাড়াবাড়ি দেখিতে পান তাহা হইলে তজ্জন্য কি হযরত ইমাম আবু হানীফাকে (রহ) দায়ী করা চলিবে? খতীবে খোওয়ার্যম ইমাম- মুয়াওফ্ফিক মক্কী (মৃঃ ৫৬৮ হিঃ) সনদ সহকারে ওয়াকী' বিনুল জররাহের বাচনিক ইমামের উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

سمعت أبا حنيفة يقول البول فى المسجد أحسن من بعض القياس -

"ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন যে, এরূপ অনেক কিয়াস আছে যেগুলির তুলনায় মসজিদে প্রস্রাব করা ভাল" [মনাকিব (১) ৯১ পৃঃ]।

উল্লিখিত উক্তি হাফিয ইবনে হযমও স্বীয় সনদ সহকারে তদীয় গ্রন্থে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইবনে হযম ইমামের পুত্র জনাব হাম্মাদের প্রমুখাৎ ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমার পিতাকে আমি বলিতে শুনিয়াছি,

من لم يدع القياس فى مجلس القضاء لم يفقه -

যে ব্যক্তি বিচারাসনে বসিয়া কিয়াস বর্জন করে না সে বিচারক ফকিহ হইবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই [আল্-ইহকাম (৮) ৩৬ পৃঃ]।

দ্বিতীয় শতকের অন্যতম মহা বিদ্বান সুফয়ান বিনে উআয়েনা (মৃঃ ১৯৮ হিঃ) সম্বন্ধে খতীব বাগদাদী লিখিয়াছেন,

كان يُعد من حكماء أهل الحديث -

তাঁহাকে আহলে হাদীস দার্শনিকগণের পর্যায়ভুক্ত করা হইত- [তারীখে বাগদাদ (৯) ৯৭৯ পৃঃ]। এই ইবনে উআয়েনা স্বয়ং বলিতেছেন যে, সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানীফাই আমাকে আহলে হাদীস মতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন [হাদায়েকুল হানাফীয়া, ১৩৪ পৃঃ (নলকিশোর)।

হযরত ইমাম আবু হানীফা যে অন্যান্য মহাবিদ্বানের ন্যায় আদৌ কিয়াস বা রায়ের সাহায্য গ্রহণ করিতেন না অথবা তাঁহার প্রতি পাদিত সিদ্ধান্ত সমুহের কোন কিছুই স্পষ্ট সুন্নাতের প্রতিকূল দাঁড়ায় নাই, এরূপ কথা আমরা বলি না, কিন্তু ইজ্‌তিহাদের সাহায্যে শরীঅতের মসআলা প্রতিপাদিত ও সম্পাদিত করা ইমাম আ'যমের বৈশিষ্ট নয়। পৃথিবীর সমুদয় বিদ্বান প্রয়োজন ক্ষেত্রে ইজ্‌তিহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইসলামকে জীবন্ত জীবনদর্শন রূপে বহাল প্রতিপন্ন করিতে হইলে ইজ্‌তিহাদের এই সনাতন পথ মুক্ত রাখিতে হইবেই। অবশ্য ইহাও অনস্বীকার্য যে, ইমাম আ'যম এবং অন্যান্য মহামতি আয়েম্মার অনেক উক্তি বিশুদ্ধ হাদীসের প্রতিকূল বিভিন্ন গ্রন্থের পৃষ্ঠায় বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু ইহার কারণ নিরূপিত করিতে হইলে স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অবতারণা করিতে হইবে।

এই স্থানে আলোচ্য বিষয় শুধু ইহাই যে, হযরত ইমাম আবু হানীফা প্রয়োজন মত রায় ও কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও কোন ক্ষেত্রেই তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তকে অপরের স্কন্ধে যবরদস্তী চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই। শহরস্তানী স্বীয় 'মিলল ওয়ান্ নহল' গ্রন্থে ইমামের উক্তি উধৃতি করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন,

علمنا هذا رأى وهو أحسن ماقدرنا عليه فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى ولنا ما رأيناه -

আমাদের এই বিদ্যা যাহা আমাদের অভিমত মাত্র, আমাদের ক্ষমতায় যতদূর কুলাইয়াছে তদনুযায়ী যাহা সর্বোত্তম আমরা তাহাই নিরূপিত করিয়াছি। যদি অন্য কোন বিদ্বান আমাদের সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে তাঁহার সিদ্ধান্ত এবং আমাদের পক্ষে আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণীয় হইবে। [(২) ৪৬ পৃঃ]।

কাযী আবু ইউসুফ (রহ) স্বীয় উসতায ইমাম আবু হানীফার (রহ) উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে,

لا يحل لاحد أن يفتى بقولنا مالم يعلم من أين قلنا -

তিনি বলিয়াছেন, আমাদের সিদ্ধান্তের সূত্র অর্থাৎ আমরা কোন্ দলীল সূত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছি ইহা অবগত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে

ফত্ওয়া প্রদান করা কাহারও পক্ষে বৈধ হইবে না- [বুস্তানে আবুল লয়েস সমরকন্দী ঃ ৮ পৃঃ]।

ইমামের এই উক্তি খাযানাতুর রেওয়ায়ত ও ফাতাওয়ায় সেরাজীয়া গ্রন্থেও উধৃত হইয়াছে। ইমাম সাহেব আরও বলিয়াছেন,

لا ينبغى لمن لم يعرف دليلى ان يفتى بكلامى -

যে ব্যক্তি আমার দলীল অবগত নহে তাহার পক্ষে আমার উক্তি সূত্রে ফতওয়া দেওয়া সঙ্গত নয় [শা'রানীর ইয়াওয়াকীৎ ও জওয়াহের (২) ২৪৩ পৃঃ; হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা ১৬২ পৃঃ; ইকদুলজীদ ৮০ পৃঃ; ইকামুল হিমাম ৭২ পৃঃ]।

শা'রানী ও শাহ্ উলীউল্লাহ লিখিয়াছেন, যে হযরত ইমাম আবু হানীফা যখন কোন ফতওয়া প্রদান করিতেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিতেন যে,

هذا راى النعمان بن ثابت وهو أحسن ماقدرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب -

ইহা নু'মান বিনে সাবিতের সিদ্ধান্ত। আমাদের ক্ষমতানুসারে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট উক্তি কিন্তু যদি কেহ ইহা অপেক্ষাও বলিষ্ঠতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সেই সিদ্ধান্তই সঠিক [মীযানে কুবরা, (১) ৬০পৃঃ; হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা ঃ ১৬২ পৃঃ]।

আল্লামা ইবনে নুজায়েম, ইবনে আবেদীন ও শামসুল আয়েম্মাহ্ করদরী ইমাম সাহেব প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا مالم يعلم من اين أخذناه -

তিনি বলিয়াছেন, আমি কুরআন ও হাদীসের ফতওয়া কোন্ দলীল অবলম্বন করিয়া দিয়াছি ইহা যে ব্যক্তি অবগত নহে তাহার পক্ষে আমার ফতওয়া অনুসরণ করা হালাল নয় [বহরুররায়েক (৬ ঃ ২৯৩ পৃ; মিনহাতুল খালেক (২) ২৯৩ পৃঃ; উমদাতুর রিআয়া ঃ ৯ পৃ]।

ফতওয়ায় শামীয়া গ্রন্থে ইমাম সাহেবের এই উক্তিও উধৃত হইয়াছে যে,

أن توجه لكم دليل فقولوا به -

যে বিষয়ের দলীল তোমাদের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে তোমরা তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত করিও [রদ্দুল মুহতার (১) ৪৭ পৃঃ]।

ইবনে আরাবী ও শা'রানী প্রভৃতি ইমাম সাহেবের উক্তি উধৃত করিয়াছেন, তিনি আদেশ করিয়াছেন যে,

إيا كم وأراء الرجال ، حرام على من لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامى ، القدرية مجوس هذه الأمة والشيعة الدجال -

সাবধান!" বিদ্বানগণের ব্যক্তিগত অভিমত সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকিও ! আমার উক্তির দলীল যে ব্যক্তি অবগত নয় তাহার পক্ষে আমার অভিমত সূত্রে ফত্ওয়া দেওয়া হারাম! যাহারা তকদীরকে অস্বীকার করে তাহারা এই উম্মতের অগ্নিপূজক এবং শিয়ারা দজ্জাল।

ইমাম সাহেব আরও বলিয়াছেন,

لا ينبغى لأحد أن يقول قولا حتى يعلم ان شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله -

কোন বিদ্বানের পক্ষে এরূপ অভিমত প্রকাশ করা কদাচ বৈধ নয় যে অভিমতের পিছনে রাসূলুল্লাহর (সা) শরীয়তের সম্মতি বিদ্যমান নাই [ফতুহাতে মক্কীয়াহ (৩) ৭০ পৃঃ; মীযানে কুবরা (১) ৬০ ও ৬১ পৃঃ]।

ফাতাওয়ায় সিরাজীয়া গ্রন্থে ইমাম সাহেবের উক্তি উধৃত হইয়াছে যে,

لأن يخطئ الرجل عن فهم خير من أن يصيبه من غير فهم !

না বুঝিয়া সুজিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অপেক্ষা বুঝিয়া ভুল করিয়া ফেলা ভাল [(৪) ৪৮৩ পৃঃ]।

সমস্যার সমাধান কল্পে হযরত ইমাম আবু হানীফা যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন আমরা তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। যাঁহারা ইমাম সাহেবের উক্তিগুলি অনুধাবন করিতে সমর্থ, তাঁহারা অবশ্যই ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন যে, ইমাম সাহেব স্বয়ং ব্যক্তিগত ভাবে হাদীসপন্থীগণেরই ইমাম ছিলেন এবং খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবা ও তায়েবী ইমামগণ সমস্যার সমাধান কল্পে যে পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন এবং যাহার বিস্তৃত বিবরণী আমরা এই পুস্ত কের গোড়ায় প্রদান করিয়াছি, ইমাম আবু হানীফা সাহেবও সেই পথের পথিক ছিলেন অর্থাৎ সমুদয় ব্যাপারে কুরআন এবং সুন্নাহর নির্দেশকে অগ্রগণ্য করা এবং যে বিষয়ে কুরআন অথবা সুন্নাতে স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান নাই সে বিষয়ে উম্মতের ইজমা অথবা ইজতেহাদের আশ্রয় অবলম্বন করাই ইমাম সাহেবের পরিগৃহীত সমাধান পদ্ধতি ছিল; বরং হযরত ইমাম শাফেয়ীর বিপরীত ইমামে আ'যম যয়ীফ ও মুর্সল হাদীস এবং সাহাবীগণের উক্তিও তাঁহার ব্যক্তিগত ইজতেহাদের অগ্রগণ্য করিতেন। কিন্তু ইমাম সাহেবের জীবদ্দশায় মহামান্য সাহাবীগণের তিরোভাব ঘটিয়াছিল এবং তদীয় শিষ্য তাবেয়ীগণ ইসলাম প্রচার ও জিহাদের তীব্র প্রেরণায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) উক্তি, আচরণ ও সম্মতিগুলি চয়ন, সংকলন ও সুসম্পাদনের

কাজ তখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই; এরূপ ক্ষেত্রে ইমামে আ'যমের সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে অবশিষ্ট অনুসরণীয় ইমামত্রয়ের তুলনায় যদি ইজতেহাদের কিছু বাড়াবাড়ি ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে উহা সঠিক ও স্বাভাবিকই হইয়াছে। বিশেষতঃ পদে পদে ইমাম সাহেব যে ভাবে দলীল ও প্রমাণের গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন এবং কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীত সিদ্ধান্ত সমূহ বর্জন করার জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করা সত্ত্বেও সুন্নাতের সুসঙ্কলিত, সুসম্পাদিত ও সুনির্বাচিত গ্রন্থ সমূহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও যদি কেহ সুন্নাতের সুস্পষ্ট নির্দেশ সমূহকে অগ্রগণ্য করিয়া চলিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তার জন্য হযরত ইমামে আ'যমকে দায়ী করা হইবে কেন? ইমাম সাহেব সম্বন্ধে কতিপয় প্রথিতযশা মহাবিদ্বানের সাক্ষ্য উধৃত করিয়া এই অনুচ্ছেদের পরিসমাপ্তি করিব।

ইমামুল আয়েম্মা শাফেয়ী (রহ) বলিয়াছেন, পৃথিবীর সমুদয় বিদ্বান ফিক্হ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার বংশধর [ইবনে খল্লাকান (২) ১৬৪]।

আহলে হাদীসগণের একচ্ছত্র ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলিয়াছেন ইমাম আবু হানীফা বিদ্যাবত্তা, পরহেযগারী, পার্থিব নির্লিপ্ততা এবং পারলৌকিক কল্যাণের আগ্রহে যে আসন অধিকার করিয়াছেন, সে আসন অন্য কেহ অধিকার করিতে পারেন নাই। ইরাকের গভর্ণর ইবনে হুবায়রা বনি উমাইয়ার অন্যতম শেষ নরপতি মারওয়ান বিনে মুহাম্মদের যুগে ইমাম সাহেবকে কুফার প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, দৈনিক দশটি করিয়া বেত্রাঘাত হযরত ইমামের পবিত্র পৃষ্ঠে হইত। এইভাবে একশত দশটি বেত্রাঘাত সহ্য করা সত্ত্বেও হযরত ইমামে আ'যম অনাচারী শাসনকর্তার অধীনে বিচারপতিত্বের পদ স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ইমাম সাহেবের এই অবস্থা যখন আলোচনা করিতেন তখনই অশ্রুপাত করিতেন এবং ইমাম সাহেবের জন্য দোয়া করিতেন। ইমাম ইবনে আবদুল বর মালেকী বলেন, সাবধান! তোমরা কেহ ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে খারাপ কথা উচ্চারণ করিও না এবং যদি কেহ তাঁহার সম্বন্ধে কোন দোষের কথা বলে, খবরদার, তাহা বিশ্বাস করিও না! আল্লাহর শপথ, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরহেযগার ও ফকীহ অত্যন্ত দুর্লভ [রদ্দুল মুহতার (১) ৩৮, ৪৩ ও ৪৫ পৃঃ]।

ইমাম সাহেব ১৫০ হিজরীর শবেবরাতের নিশীথে বাগদাদের কারাগারে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, রহমাতুল্লাহে আলায়হি ওয়া রাযিয়া আনহু!

দারুল হিজরতের ইমাম মালিক বিনে আনস্ (রহ)[১]

فخر الأئمه مالك !

نعم الامام السالك !

مولده نجم هدى !

وفاته فاز مالك !

মালিক বিনে আনস বিনে মালিক বিনে আবি আমির বিনে আমির বিনে আমর বিনুল হারিস বিনে গয়মান বিনে খুসয়র বিনে আমর বিনুল হারিস বিনে হারস। ইমামের বংশের আদি পুরুষ হারিস বিনে হারস ইয়ামনের হেময়রী গোত্রের দলপতি ছিলেন। হেময়র বিনে সিবার অন্যতম শাখা আসবাহ্ গোত্রে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইমাম মালিক আসবাহী রূপে আখ্যাত হইয়াছেন। আবদুল্লাহ বিনে মসঅব বলেন যে, মালিক বিনে আবি আমির ইয়ামনের শাসনকর্তাদের হস্তে নিপীড়িত হইয়া মদীনায় আগমন করেন এবং তৈয়েম বিনে মুররাগোত্রের জনৈক ব্যক্তির সহিত সখ্যতা ও চুক্তি সূত্রে আবদ্ধ হন [ইনতিকা ঃ ১২ পৃঃ]। কিন্তু কেহ কেহ একথাও লিখিয়াছেন যে, মালিক বিনে আবি আমিরের পিতা আবু আমির বিনে আমির দ্বিতীয় হিঁজরীতে হিজরত করিয়া ইয়ামন হইতে মদীনায় পদার্পণ করেন এবং রাসুলুল্লাহর (সা) পবিত্র হস্তে দীক্ষিত হন। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, বদরের যুদ্ধ ছাড়া হযরত আবু আমির রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সহিত সমস্ত জিহাদে যোগদান করিয়াছেন [মুসাফ্ফা ঃ ৩ পৃষ্ঠা]।

ইমামের পিতামহ মালিক বিনে আবি আমিরকেও আমাদের প্রদত্ত পূর্ব বর্ণনা সূত্রে কেহ কেহ সাহাবীগণের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণীর সময়ে মালিক বিনে আবি আমির স্থায়ী ভাবে মদীনায় বসবাস আরম্ভ করিয়া দেন। হযরত উসমানের শাহাদতের পর তাঁহার দাফন কাফনের সঙ্কটপূর্ণ দায়িত্ব এই মালিক বিনে আবি আমিরও গ্রহণ করিয়াছিলেন [তাবারী]।

ইমাম মালিকের পিতা আনস বিনে মালিক তাবেয়ী ছিলেন। তিনি ৯৩ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

---

[১] ইমামকুল গৌরব মালিক! উৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক ধর্মগুরু! হিদায়তের নক্ষত্র তাঁহার জন্মসন নিহিত আছে, "আর সাফল্যমণ্ডিত মালিক" তাঁহার ওফাতের তারীখ।

ইমাম মালিক সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, তিনি দুই হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে ৯৩ হিজরীর রবিউল আউওয়াল মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ ইমাম মালিকের উস্তাযগণের সংখ্যা নয়শতের অধিক নির্ণয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে তাবেয়ীগণের সংখ্যা ছিল তিনশত আর তাবে-তাবেয়ীগণ ছিলেন ছয়শত জন। আমরা নিম্নে ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট শিক্ষকবৃন্দের নাম উল্লেখ করিতেছি ঃ - মোহাম্মদ বিনুল মুনকদের, নাফে' মওলা আব্দুল্লাহ বিনে উমর, আবুয্যুবয়র আবু হাযিম, ইবনে শিহাব যুহরী, আবদুল্লাহ বিনে দীনার, কাসেম বিনে মুহাম্মদ আবি বক্‌র, হিশাম বিনে উরওয়া, রবীআতুররায়, উরওয়া বিনুযযুবয়র, উবায়দুল্লাহ বিনে উৎবা বিনে মসউদ, সালিম বিনে আবদুল্লাহ বিনে উমর, আমের বিনে আবদুল্লাহ, জা'ফর সাদিক, নাফ' বিনে মালেক, খারেজা বিনে যয়দ, সঈদ বিনুল মুসাইয়েব, সুলায়মান বিনে ইয়াসার প্রভৃতি।

ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদ বলিয়াছেন, ইমাম মালিক হাদীস শাস্ত্রের অবিসম্বাদিত ইমাম [বুখারীর তারীখে ছগীর, ২০৩ পৃঃ]। ইমামের সহযোগী আবদুর রহমান বিনে মহ্‌দী বলেন, আজ পৃথিবীর বুকে ইমাম মালিক অপেক্ষা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হাদীসের বড় রক্ষক আর কেহ জীবিত নাই, [আল্‌ ইন্‌তিকা, ৪ পৃঃ; শাহ্‌ ওলিউল্লাহর মুসাফ্‌ফা ঃ ৩ পৃঃ]। ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদুল কাত্‌তানের সাক্ষ্য এই যে, ইমাম মালিক হাদীস শাস্ত্রের আমীরুল মুমেনীন [মুসাফ্‌ফা, ৫ পৃঃ] ওয়াহ্‌হাব বলিয়াছেন, মালিক আহলে হাদীসগণের ইমাম [যহবীর তযকিরাতুল হুফ্‌ফায (১) ১৯৫ পৃঃ]। ইমাম মুসলিম বলিয়াছেন, মালিক আহলে হাদীসগণের ইমাম ছিলেন [সহীহ মুসলিম (১) ৫ পৃঃ]। উসতায আবদুল কাহের বাগদাদী লিখিয়াছেন, ইমাম মালিক স্বীয় যুগে আহলে হাদীসগণের ইমাম ছিলেন [উছুলুদদীন (১) ২৬৩ পৃঃ] ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম মালিক উজ্জ্বল নক্ষত্র [আল-ইনতিকা,১৯ পৃঃ]। সুফিয়ান সওরী বলেন, মালিক বিনে আনসের সমকক্ষতায় আমরা কি? [মুসাফ্‌ফা ঃ ৪ পৃঃ]ইমাম আবু হানীফার অন্যতম প্রধান শিষ্য মুহাম্মদ বিনুল হাসান শয়বানী বলেন, আমি ইমাম মালিকের নিকট ন্যূনাধিক তিন বৎসরকাল অবস্থান করিয়াছিলাম এবং তাঁহার বাচনিক ৭ শতের অধিক হাদীস শ্রবণ করিয়াছিলাম [আল-ইন্‌তিকা, ২৫ পৃঃ]। বুখারী সাক্ষ্য দিয়াছেন, ইমাম মালিক বিন আনস, কুনিয়ৎ আবু আবদুল্লাহ অবিসম্বাদিত ইমাম ছিলেন [তযকিরা]। আশহব বিনে আবদুল আযীয বলেন, পুত্র পিতার সম্মুখে যেভাবে অবস্থান করে, আমি ইমাম আবু হানীফাকে সেই ভাবে ইমাম মালিকের সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়াছি। হাফেয যহবী ইহার উপর মন্তব্য করিয়াছেন

যে, এই ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার সৌজন্য, বিনয় ও শিষ্টাচারই প্রমাণিত হইয়াছে, কারণ তিনি ইমাম মালিক অপেক্ষা তের বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সহিত এরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন।

ইমাম নসয়ী ইমাম মালিক সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে,

أمَنَاءُ الله عزوجل على علم رسوله عليه الصلوة والسلام شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحي بن سعيد القطان، وما أحد عندى بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس ولا أحد آمن على الحديث منه

আল্লাহর রাসূলের (সা) বিদ্যার বিশ্বস্ত প্রহরী হইতেছেন হাজ্জাজের পুত্র শো'বা, আনসের পুত্র মালিক এবং সঈদুল কত্তানের পুত্র ইয়াহ্‌য়া।আমার বিবেচনায় তাবেয়ীগণের পর মালিক বিন আনস অপেক্ষা মহাপণ্ডিত এবং হাদীস শাস্ত্রে অধিকতর নির্ভরযোগ্য আর কেহ নাই [ইয়াফেয়ী (১), ৩৭৫ পৃঃ]।

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন,

مالك بن أنس اتبع من سفيان و أحسن حديثا عن الزهرى من ابن عيينة -

মালিক বিনে আনস সুফ্‌য়ান সওরী অপেক্ষা অধিক অনুসরণ যোগ্য এবং যুহরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইব্‌নে উআয়না অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর [ইন্‌তিকা, ৩০ পৃঃ]।

হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস ইমাম মালিকের সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং যথার্থ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ বর্ণনার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইমাম মালিকের বিশ্ববরেণ্য হাদীস গ্রন্থ "মুওয়াত্তার" ভাষ্য "মুসাফ্‌ফার" ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন ঃ ইমাম মালিক দীর্ঘকৃতি, বৃহৎ মস্ত কধারী, মস্তকের তালুতে টাক-যুক্ত, অত্যন্ত শুভ্রকান্তি, রক্তিমাভ, পরম রূপবান ছিলেন। মস্তক ও দাড়ির কেশ শুভ্র ছিল। হাদীস শাস্ত্র প্রায় সমস্তটাই মদীনা শরীফের বিদ্বানগণের নিকট হইতে আহরণ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিদ্যা তাঁহাদের নিকট হইতে হাতে হাতে গ্রহণ করেন, গোড়ায় ফিক্‌হ ও ফত্‌ওয়া হযরত উমর ফারুকের উপর নির্ভর করিত। তিনিই এই তস্‌বীহের শীর্ষমণি ছিলেন, তাঁহার তিরোভাবের পর এই দায়িত্ব ফকীহ সাহাবীগণ, যথা ইবনে উমর, জননী আয়িশা, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আনস ও জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) প্রভৃতির উপর ন্যস্ত হয় এবং তাঁহারাই এই চক্রের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হন। তাঁহাদের তিরোধানের পর এই কার্যভার তাবেয়ীগণের ফকীহ সপ্তকের উপর পতিত হয়, যথা ঃ সঈদ বিনুল মুসাইয়েব, উরওয়া বিনুয্‌যুবায়র, সালেম বিনে আবদুল্লাহ বিনে উমর, কাসেম বিনে মুহাম্মদ

বিনে আবি বকর সিদ্দীক এবং অতঃপর যুহ্‌রী, ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদ আনসারী, যয়েদ বিনে আস্‌লাম, রবীআতুর রায়, ইব্‌নুয্ যনাদ, নাফে' প্রভৃতি। ইহাদের মহা প্রস্থানের পর ইহাদের সকলের বিদ্যার উত্তরাধিকারী হন ইমাম মালিক। তিনি ইহাদের সকলের হাদীস ও ফত্‌ওয়া সুসংকলিত করেন। এতদিন পর্যন্ত যাহা উস্‌তাযদের সীনা হইতে ছাত্রদের সীনায় স্থানান্তরিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা এক্ষণে কাগজের উদরে সমর্পিত হইল, ইসলাম জগতের সমস্ত নগর নগরীর বিদ্যার্থীগণ তাঁহার মুখাপেক্ষী হইলেন, হাদীসের রেওয়ায়তের দিক দিয়া হউক কিংবা ফতওয়ার দিক দিয়া, সকল দিক দিয়াই তিনি আপন যুগের বিদ্বানগণের মুকুটমণি হইলেন এবং এরূপ প্রসিদ্ধি ও শ্রদ্ধা লাভ করিলেন যে, অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার তুল্য দূরে থাক, তাঁহার কাছাকাছিও পৌঁছিতে পারেন নাই। [৫ ও ৬ পৃষ্ঠা]।

মুহাদ্দিস দেহলভী পুনশ্চ লিখিতেছেন, "মোটের উপর এই চারিজন ইমামের বিদ্যা ইসলাম জগতকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, যথা, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল। শেষোক্ত দুইজন অর্থাৎ শাফেয়ী ও আহমদ ইমাম মালেকেরই শিষ্য এবং তাঁহার বিদ্যার আহরণকারী ছিলেন। এই চারিজনের মধ্যে শুধু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক তাবেয়ীগণের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা এমন ব্যক্তি যে, নেতৃস্থানীয় হাদীস শাস্ত্রবিশারদগণ যথা ঃ ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবনে মাজা ও ইমাম দারমী স্ব স্ব হাদীস গ্রন্থে তাঁহার বাচনিক একটি হাদীসও রেওয়ায়ত করেন নাই এবং ইমাম আবু হানীফা দ্বারা হাদীস রেওয়ায়ত করার রীতি প্রবর্তিত হয় নাই। অথচ দ্বিতীয় জন অর্থাৎ ইমাম মালিক এরূপ ব্যক্তি, যাঁহার সম্বন্ধে হাদীস তত্ত্ববিশারদগণ একমত হইয়াছেন যে, কোন হাদীস ইমাম মালিকের রেওয়ায়ত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে উহা বিশুদ্ধতার উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।" [৬ ও ৭ পৃঃ] শাহ্ সাহেব আরও লিখিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর মযহবের গোড়া এবং তাঁহার ইজতিহাদের ভিত্তি হইতেছে ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা! অবশ্য বিভিন্ন স্থানে ইমাম শাফেয়ী উহার ত্রুটিও উদঘাটিত করিয়াছেন এবং ইমাম মালিক কর্তৃক অগ্রগণ্য রেওয়ায়ত সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন। মবসূৎ প্রভৃতি গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফার শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসান ব্যবহার শাস্ত্রে যে পান্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার পুঁজিও ইমাম মালিকের এই মুওয়াত্তা। অন্যথায় তাঁহার "আসারে" ইমাম আবু হানীফার প্রমুখাৎ তিনি যে সকল রেওয়ায়ত উপস্থিত করিয়াছেন, ফিকহ্ শাস্ত্রের সমুদয় মসআলার পক্ষে সেগুলি আদৌ যথেষ্ট নয়। ইমাম মুহাম্মদ স্বীয় মুওয়াত্তায় ইমাম মালিকের রেওয়ায়তগুলির উল্লেখ প্রসংগে অনেক স্থানে বলিয়াছেন, আমার উক্তিও ইহাই এবং ইমাম আবু হানীফাও এই কথাই বলিতেন

(৭ পৃষ্ঠা]। ইমাম মালিক শুধু একজন রাবী-নাফে' বা আবদুল্লাহ্ বিন দীনারের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ্ বিনে উমরের প্রমুখাৎ এবং ওয়াহ্‌হাব বিনে করসানের মাধ্যমে হযরত জাবিরের প্রমুখাৎ এবং শুধু দুইজন রাবী, যথা ঃ যুহরী ও কাসেম বিনে মুহাম্মাদের মাধ্যমে হযরত আয়িশার প্রমুখাৎ বহু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন অথচ ইমাম আবু হানীফা ইমাম মালিক অপেক্ষা তের বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সাহাবীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিতে তাঁহার সনদে অন্ততঃ তিন জন রাবীর মাধ্যমে হাদীস রেওয়াত করিতে হইয়াছে। যথা ঃ কিতাবুল আসারে হযরত আবদুল্লাহ্ বিনে উমরের রেওয়ায়তের জন্য হাম্মাদ, মুসা বিনে মুসলিম ও মুজাহিদের মধ্যস্থতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে [সফরের নামায অধ্যায়]।

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء -

সমস্যার সমাধান কল্পে ইমাম মালিক যে পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন, তাহা অত্যন্ত সুবিদিত, তথাপি তাঁহার কয়েকটি প্রসিদ্ধতম উক্তি নিম্নে সংকলিত হইলঃ

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ ইমাম মালিকের এই উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে,

إنما انا بشر أصيب و أخطئ فاعرضوا قولى على الكتاب والسنة -

"আমি একজন মানুষ মাত্র, কোন বিষয়ে আমার অভিমত যেমন সঠিক হইতে পারে, তেমনি ভ্রান্তিপূর্ণ হওয়াও সম্ভবপর, অতএব তোমরা আমার উক্তি কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা যাচাই করিয়া দেখিবে!" [ফাতাওয়া (২) ৩৮৪ পৃষ্ঠা]।

আল্লামা ফাল্লানী অবিচ্ছিন্ন সনদ সহকারে হাফিয ইবনে হজর, ইমাম হুমায়দী, হাফেয ইবনে আবদুল বর, ইমাম ইবনুল মনযর প্রভৃতি বিদ্বানগণের মাধ্যমে ইমাম মালিকের ছাত্র ম'অন বিনে ঈসার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম মালিককে বলিতে শুনিয়াছি যে,

إنما انا بشر أخطئ وأصيب ! فانظروا في رائي فكلما وافق الكتاب والسنة، فخذوه وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه -

"আমি একজন মানুষ মাত্র! আমারও ভুলচুক হয় আর সঠিক অভিমতও আমি দিয়া থাকি। অতএব তোমরা সর্বদা আমার অভিমত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। আমার যে অভিমত কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূল পাইবে, তাহা গ্রহণ করিবে আর যে অভিমত কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিকূল দেখিবে তাহা প্রত্যাখান করিবে।" আহমদ বিনে মারওয়ান মালেকী ও স্বীয় সনদে ইমামের উল্লিখিত উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন [ঈকাযুল হিমম, ১০২ পৃষ্ঠা]। ইমাম শওকানীও হাফিয ইবনে আবদুল বরের মধ্যস্থতায় ইমামের উপরিউক্ত বাণী স্বীয় পুস্তকে

সন্নিবেশিত করিয়াছেন [কওলুল মুফীদ ঃ ১৭ পৃষ্ঠা]। ইবনে মদয়ন স্বীয় মনসকে ম'অন বিনে ঈসার প্রমুখাৎ ইমাম মালিকের এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন এবং আজহরী ও জোশী তাঁহাদের মুখতসর খলীলের ভাষ্যে ইমামের এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন [কওলুল মুফীদ, ২৪ পৃষ্ঠা]। ঈসা বিনে দীনার ইমামের ছাত্র ইবনুল কাসেমের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, ইমাম মালিক বলিয়াছেন,

ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله عزوجل الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسن -

কোন মানুষ যত বড় সম্মানিত হউক না কেন, তাঁহার প্রত্যেকটি কথা অনুসরণ যোগ্য হইতে পারে না, কারণ যাহারা কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করার পর তন্মধ্য হইতে যাহা উত্তম, কেবল তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, আল্লাহ কুরআনে শুধু তাহাদেরই প্রশংসা করিয়াছেন [জামেয়ো বয়ানিল ইলম, ১৭৩ পৃষ্ঠা; ই'লামুল মওয়াক্কেয়ীন (২) ৩০০ পৃষ্ঠা]।

শ'অরাণী, শাহ ওলীউল্লাহ, আল্লামা মুঈন ও সৈয়েদ রশীদ রিযা প্রভৃতি স্ব স্ব গ্রন্থে ইমাম মালিক সম্বন্ধে উধৃত করিয়াছেন যে, তিনি প্রায়শঃ মদীনা তৈয়েবার মসজিদে বসিয়া রসূলুল্লাহর (সা) পাক রওযার দিকে অংগুলি সংকেত করিয়া বলিতেন যে,

مامن أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا كلام صاحب هذا القبر !

এই কবর যাঁহার, তিনি ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নাই যাঁহার উক্তি বাছাই করিয়া গৃহীত ও পরিত্যক্ত হইবে না [ইয়াওয়াকীৎ ওয়া জওয়াহের (২) ২৪৩ পৃষ্ঠা; হুজ্জাতুল্লাহেল বারেগা, ১৬০ পৃষ্ঠা; ইকদুল জীদ, ৮০ পৃষ্ঠা; দিরাসাতুল লবীব, ৮৫ পৃষ্ঠা; মুহাবিরাৎ, ১০৬ পৃঃ]।

ইবনে আবদুল বর ইবনে ওয়াহাবের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে ইমাম মালিক বলিয়াছেন-

ياعبد الله، ماعلمته فقل به ودل عليه، ومالم تعلم فاسكت عنه، وإياك ان تتقلد للناس قلادة سوء -

হে আবদুল্লাহ, তুমি যাহা অবগত আছ, তাহাই বল এবং উহার প্রমাণ প্রদান কর আর যে কথার প্রমাণ অবগত নও, সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিওনা। সাবধান! কোন বিদ্বানের অভিমতের অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া ফতওয়া দিওনা [বয়ানুল ইলম, ১৯১ পৃষ্ঠা]।

হাফিয আবু নঈম ইসফেহানী স্বীয় সনদ সহকারে ইমাম মালিক বিনে আনসের প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন,

إيا كم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن !

তোমরা সিদ্ধান্তবাগীশদের (আহলে রায়) সম্বন্ধে সাবধান থাকিও, কারণ তাহারা সুন্নাতের শত্রু [ইবনে হযমের আল ইহ্কাম (৬), ৫৬ পৃঃ]।

উসমান বিনে সালেহ বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি ইমাম মালিককে একটি মসআলা জিজ্ঞাসা করিল, তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। লোকটি বলিল, আপনার অভিমত কি তাহাই? ইমাম সাহেব বলিলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ -

আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন যাহারা রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশের ব্যতিক্রম করে তাহারা যেন সাবধান হয়, কারণ তাহারা হয় বিপদে পতিত হইবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক দণ্ড তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে [ইহ্কাম (৬), ৫৬ পৃঃ]।

সহনুন ও হারিস বিনে মিসকীন ইমামের ছাত্র ইবনুল কাসিমের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ইমাম সাহেব কোন জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রায়শঃ কুরআনের এই আয়তটি পাঠ করিতেন,

إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ -

আমরা শুধু ধারণাই করিয়া থাকি, আমরা নিঃসন্দেহবাদী নই [ইহকাম (৬) ৫৬ পৃঃ; ইল্ম (২) ৩৩ পৃঃ; ই'লাম (১) ৮৭ পৃঃ]।

হারিস বিনে মিসকীন ইমামের ছাত্র ইবনে ওয়াহাবের প্রমুখাত রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ইমাম মালিক আমাকে বলিলেন ঃ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين ، يسأل عنه الشئ فلا يجيب حتى يأتيه الوحى من السماء

"রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম জাতির পথ প্রদর্শক এবং বিশ্ববাসীর অধিনায়ক ছিলেন অথচ তিনি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে উর্ধ জগতের ওয়াহী প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তর প্রদান করিতেন না [ইহকাম (৬) ৫৭ পৃঃ; ই'লাম (১) ৩১২ পৃঃ]।

আহমদ বিনে সিনান আবদুর রহমান বিনে মহদীর প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, আমরা একদা ইমাম মালিকের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া ইমাম সাহেবকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহর পিতা, আমি ছয় মাসের পথ অতিক্রম করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার দেশবাসীরা আপনার নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইমাম

সাহেব বলিলেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা কর, তখন লোকটি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। ইমাম সাহেব বলিলেন -

فقال مالك بن انس لا أحسن ! قال ابن مهدي فبهت الرجل كأنه قدجاء الى من يعلم كل شئ ! فقال : أى شئ أقول لأهل بلدى إذا رجعت إليهم ؟ قال مالك : تقول لهم : قال مالك لا أحسن !

"আমার এ বিষয় ভাল জানাশুনা নাই। ইবনে মহদী বলিতেছে, ইমাম সাহেবের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসাকারী যেন হতভম্ব হইয়া পড়িল! সে মনে করিয়াছিল যে, এমন ব্যক্তির কাছে সে আগমন করিয়াছে যাহার অবিদিত কোন কিছুই থাকিতে পারে না। লোকটি তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে আমি আমার দেশবাসীগণের কাছে ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে কোন কথা বলিব? ইমাম সাহেব বলিলেন, বলিও মালিকের এই বিষয়ে ভাল জানাশুনা নাই [ইবনে আবদুল বর (২), ৫৩ পৃঃ]।

ইমাম ইবনে জরীর তদীয় 'তহযীবুল আসার' গ্রন্থে ইসহাক বিনে ইবরাহীমের প্রমুখাৎ উধৃত করিয়াছেন যে, ইমাম মালিক বলিয়াছেন,

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغى أن تتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع الرأى ، فإنه متى اتبع الرأى جاء رجل أخر أقوى فى الرأى منك فاتبعه، فانت كلما جاء رجل عليك اتبعه، أرى هذا لا يتم !

"রাসূলুল্লাহ (সা) চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং শরীয়তের বিধান শেষ হইয়াছে এবং পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে শুধু রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস সমূহই অনুসরণ করিয়া যাওয়া কর্তব্য। কাহারও ব্যক্তিগত অভিমতের অনুসরণ করিয়া চলা উচিত নয়। কারণ যদি তুমি একবার কোন মানুষের অভিমত অনুসরণ করিয়া চলিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে তোমার সহিত পরবর্তী কোন ব্যক্তির যখন সাক্ষাৎকার ঘটিবে আর তাহার অভিমত তুমি পূর্বপরিগৃহীত অভিমত অপেক্ষা দৃঢ়তর মনে করিবে তখন তোমাকে তাঁহারই অনুসরণ করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে পর পর যত লোকেরই আবির্ভাব ঘটিবে, তাঁহাদের অভিমতের বলিষ্ঠতা দেখিয়া তুমি যদি এইভাবে তাঁহাদের অভিমতের অনুসরণ করিতে থাক তাহা হইলে বিষয়টির কখনও শেষ মীমাংসা ঘটিবে না [ইলম (২), ১৪৪ পৃঃ ই'লাম (১), ৯০ পৃঃ]।

ইমাম করাখী স্বীয় মালেকী উসূলে ফিকহের গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

مذهب الإمام مالك (رضى) وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد

ইজতিহাদ ওয়াজিব এবং তকলীদ (বিনা প্রমাণে কোন ব্যক্তির অভিমত মান্য করা) বাতিল হওয়াই হইতেছে ইমাম মালিকের মযহব, [শরহে তনকীহুল ফসূল, ১৯৫ পৃষ্ঠা]।

ব্যবহারিক শাস্ত্র সম্পর্কীয় সমস্যা সমূহের সমাধান কল্পে দারুল হিজরতের ইমাম হযরত মালিক বিনে আনস যে পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন আমরা এতক্ষণ ধরিয়া তাহা আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর ইসলামী আকীদার যে সকল মূলনীতি লইয়া আহলে হাদীসগণের সহিত আশায়েরা, মু'র্জিয়া, জহমিয়া কদরীয়া ও রাফেযীদের মোটামুটি মতভেদ ঘটিয়াছে সেই সকল বিষয়ে ইমাম মালিকের অভিমত আমরা নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।

ইমাম মালিকের (রহ) আকীদা

হাফেয ইবনে আবদুল বর স্বীয় গ্রন্থে ইমামের অন্যতম ছাত্র ইবনে ওয়াহ্হাবের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, মালিক বিনে আনস ঈমান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলেন, তিনি বলিলেন, উক্তি ও আমলের নাম ঈমান। ইবনে ওয়াহ্হাব বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঈমানের কি হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে? তিনি বলিলেন, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঈমান বর্ধিত হইয়া থাকে। তিনি ইহাও বলিলেন যে, ষোল মাস ধরিয়া সাহাবীগণ বায়তুল মকদসের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতেন অতঃপর তাঁহারা কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং আল্লাহ বলিয়াছিলেন,

وما كان الله ليضيع إيمانكم

"এবং আল্লাহ তোমাদের ঈমান কিছুতেই নষ্ট করিবেন না।" এই আয়াতে ঈমানের তাৎপর্য বায়তুল মকদসের দিকে পঠিত নামায। ইমাম মালিক বলেন, মুর্জিয়ারা দাবী করিয়া থাকে যে, নামায ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়, আমি তাহাদের দাবীর জওয়াবে এই আয়াতটি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

আবদুর রায্যাক বিনে হুমাম বলেন, যে, আমি ইবনে জুরয়জ, সুফয়ান সওরী, মা'মর বিনে রাশেদ, সুফয়ান বিনে উআয়না এবং মালিক বিনে আনসকে বলিতে শুনিয়াছি, তাঁহারা সকলেই বলিতেন, ঈমান উক্তি ও আচরণকে বলে, ইহা বর্ধিত ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইমাম মালিক ইহাও বলিতেন যে, কুরআন আল্লাহর কালাম, যে ব্যক্তি কুরআনকে সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া থাকে, তাহাকে তওবা না করা পর্যন্ত কারারুদ্ধ ও বেত্রাঘাত করা উচিত।

ইমাম সাহেব ইহাও বলিতেন যে, আল্লাহ উর্ধ্বজগতে বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহার জ্ঞান সর্বত্র বিদ্যমান।

ইমাম মালিক জিজ্ঞাসিত হইলেন, আহ্‌লে সুন্নাতগণের নাম কি? তিনি বলিলেন, আহ্‌লে সুন্নাতগণের এমন কোন পদবী নাই যাহার দ্বারা তাঁহারা পরিচিত হইতে পারেন তাঁহারা জহমী, কদরী বা রাফেযী নহেন।

ইমাম সাহেব বলেন যে, যে ভূখন্ডে আল্লাহ্‌র সত্য সনাতন বিধির অনুসরণ করা হয় না এবং পূর্ববর্তীগণের (সাহাবা ও তাবেয়ীগণ) নিন্দাবাদ করা হয় তথায় বসবাস করা উচিত নয়।

ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসিত হইলেন, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহকে কি দেখিতে পাওয়া যাইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ! আল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন-

وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة !

সে দিবস কতক চেহারা সরস হইবে, তাঁহাদের প্রভুর দিকে অবলোকনকারী। আর একদল সম্বন্ধে আল্লাহ বলিয়াছেন-

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون !

কিছুতেই নয়, তাহারা সে দিবস তাহাদের প্রভুর সন্দর্শন হইতে ঢাকা পড়িয়া যাইবে। ওলীদ বিনে মুসলিম বলেন, যে, আমি আওযায়ী, সুফয়ান সওরী ও মালিক বিনে আনসকে আল্লাহর সন্দর্শন, সম্পর্কিত হাদীসগুলির তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা সকলই সমবেতভাবে আমাকে জওয়াব দেন যে, যেরূপ ভাবে হাদীসগুলি বর্ণিত হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ কর- [৩৭ পৃষ্ঠা]।

আবদুল্লাহ বিনে নাফেঅ বলেন যে, ইমাম মালিক বলিয়াছেন, আল্লাহ আকাশে এবং তাঁহার জ্ঞান সর্বত্র। ইমাম সাহেব ইহাও বলিয়াছেন,

الإستواء لاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ـ

আল্লাহর আরশে বিরাজমান থাকা সুবিদিত কিন্তু কিভাবে বিরাজিত তাহা অপরিজ্ঞাত এবং একথার উপর ঈমান স্থাপন করা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা বিদআত [তযকিরাতুল হুফফায, (১), ১৯৫ পৃঃ]।

ইমাম মালিক প্রায়শঃ যে কবিতাটি পাঠ করিতেন, তাহার অবতারণা করিয়া ইমামের আকীদা সম্পর্কিত প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি ঃ

خير أمور الدين ما كان سنة
وشر الأمور المحدثات البدائع !

অর্থাৎ যাহা সুন্নাত তাহাই হইতেছে দীনের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ এবং যেগুলি নবাবিষ্কৃত- অভিনব, সেইগুলি হইতেছে সর্বাপেক্ষা বিগর্হিত কর্ম [ইনতিকা, ৩৭ পৃঃ]।

ইমাম সাহেবের অগ্নি পরীক্ষা

সত্যপরায়ণ ও সত্যজীবী বিদ্বানগণের ন্যায় ইমাম মালিককেও দুনিয়াপরস্ত শাসনকর্তাগণের কোপানলে পতিত হইয়া ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা প্রদান করিতে হইয়াছিল এবং সত্যজীবী ও সত্যপরায়ণগণের ন্যায় রাসূলুল্লাহর (সা) এই সুযোগ্য ওয়ারিস সেই অগ্নি পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কি কারণে তিনি তদানীন্তন আব্বাসী শাসক গোষ্ঠীর কোপানলে পতিত হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। ইবনুল ইমাদ ও ইবনুল জওযী প্রভৃতি ১৪৭ হিজরীর ঘটনা প্রসংগে বলিয়াছেন যে, যবরদস্তীর তালাক বলিয়া অসিদ্ধ অথবা যবরদস্তীর শপথ পন্ড বলিয়া যে সকল হাদীস রাসূলুল্লাহর (সা) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, সেই হাদীসগুলি তদানীন্তন শাসক গোষ্ঠীর পশুবৃত্তির অন্তরায় হওয়ায় তাঁহারা ইমাম মালিককে এই সকল হাদীস রেওয়ায়ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইমাম সাহেব তাঁহাদের নিষেধাজ্ঞার প্রতি দৃকপাত না করিয়া প্রকাশ্যভাবে সেই সকল হাদীস রেওয়ায়ত করিতেন। ফলে খলীফা আবু জা'ফর মনসুরের আদেশে ইমাম মালিক ধৃত হইয়া বাগদাদে নীত হন। কেহ কেহ বলেন, মুত্‌আ বা ঠিকা বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে ইমাম সাহেব বলেন, উহা হারাম। আব্বাসী শাসকরা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আবদুল্লাহ্‌ বিনে আব্বাসের উক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলিতে চান? ইমাম সাহেব জবাব দেন যে, এই মসআলায় অন্য বিদ্বানগণের উক্তি ইবনে আব্বাসের তুলনায় কুরআনের সহিত অধিকতর সুসমঞ্জস। ইমাম সাহেব মুত্‌আর হারাম হওয়ার ফত্‌ওয়া সনির্বন্ধ ভাবে বারবার জোরের সহিত উচ্চারণ করিতে থাকেন। তাঁহাকে একটি উত্তেজিত পেট খারাপ ষাড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া বাগদাদ শহর প্রদক্ষিণ করান হয়। ষাড়ের মল ও ময়লা ইমাম সাহেব তাঁহার পবিত্র বদন মণ্ডল হইতে মুছিতেন আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন,

ياأهل بغداد ! من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فليعرفني أنا مالك بن أنس ! فعل بي ماترون لأقول بجواز نكاح المتعة ولا أقول به ـ

"হে বাগদাদের অধিবাসীবৃন্দ, তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে চিন, তাহারা তো চিনিয়াছই, কিন্তু যাহারা আমাকে চিননা তাহারা আমার পরিচয় গ্রহণ কর, আমি আনসের পুত্র মালিক! আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইতেছে তোমরা দেখিতেছ, আমি যাহাতে ঠিকা বিবাহ জায়েয হইবার ফতওয়া দেই তজ্জন্য আমার সংগে এই ব্যবহার করা হইতেছে, কিন্তু আমি কিছুতেই এই কার্যকে জায়েয বলিব না- [শযরাতুয্‌ যহব (১), ২৯০, মনাকীবে আহমদ (ইবনে জওযী), ৩৪৩ পৃঃ]। অন্যান্য ঐতিহাসিকরা বলিয়াছেন যে, হযরত ইমাম মালিক আব্বাসী খলীফাদের আনুগত্য স্বীকার করার শপথকে বাতিল মনে করিতেন এবং

এই কথা তিনি প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত করিতেন। মদীনার তদানীন্তন শাসনকর্তা জা'ফর বিনে সুলায়মান ইহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ইমাম সাহেবকে ধৃত করেন। তাঁহাকে বিবস্ত্র করিয়া তাঁহার প্রসারিত হস্তে সত্তরটি কোড়ার আঘাত করা হয়।

ইহার ফলে তাঁহার একটি হস্তের কব্জি সম্পূর্ণরূপে খসিয়া যায়। ইবরাহীম বিনে হাসাদ বলেন যে, আমি ইমাম সাহেবের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলাম, তিনি যখন জা'ফরের দরবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন তখন তিনি তাহার একটি হস্ত অপর হস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন [আল ইনতিকা, ৪৩ পৃষ্ঠা]।

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের প্রতি ইমাম মালিকের অপরিসীম শ্রদ্ধা

দারুল হিজরত মদীনা -তাইয়েবার ইমাম হযরত মালিক বিনে আনস (রহ) রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র হাদীসসমূহের প্রতি কিরূপ অসামান্য শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, সে সম্পর্কে ইমাম সাহেবের অন্যতম ছাত্র স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও মুজাহিদ হযরত আব্দুল্লাহ বিনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) এক রোমাঞ্চকর ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, একদা আমি ইমাম সাহেবের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস রেওয়ায়ত করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে একটি বৃশ্চিক দশ বারের অধিক ইমাম সাহেবকে দংশন করে, তাঁহার বদন মন্ডল বিবর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তিনি অঙ্গ সঞ্চালন পর্যন্ত না করিয়া সমানভাবে হাদীসের রেওয়ায়ত করিতে থাকেন। রেওয়ায়ত শেষ হইলে বৃশ্চিকটি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। ইবনুল মুবারক এ বিষয়ে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, স্বীয় ধৈর্য্য শক্তি প্রদর্শন করার জন্য এরূপ করি নাই, রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের প্রতি সম্মানের বশবর্তী হইয়াই আমাকে এই কার্য করিতে হইয়াছে- [যুর্কানীর শরহে মুআত্তা, উপক্রম ভাগ (১), ৩ পৃষ্ঠা]।

ইমাম সাহেবের কূপমণ্ডুকতা বিরোধী নীতি

বর্তমান জগতে ইলমুল হাদীসের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হইতেছে "মু'আত্তা ইমাম মালিক"। ইমাম সাহেব সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে এই অমূল্য গ্রন্থ সংকলিত ও সুসম্পাদিত করিয়াছিলেন। খলিফা মনসুর আব্বাসী এই অপূর্ব গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হইয়া হজ্জ করিতে আসিয়া ইমাম সাহেবের নিকট প্রস্তাব করেন, আমি আপনার প্রণীত গ্রন্থগুলি নকল করাইয়া মুসলিম অধ্যুষিত নগরসমূহে প্রেরণ করিতে এবং সর্বত্র এই আদেশ প্রচার করিতে চাই

যে, সকলকে শুধু আপনার গ্রন্থগুলিরই অনুসরণ করিতে হইবে এবং কেহ ওগুলিকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারিবে না। ইমাম সাহেব খলিফার প্রস্তাবের উত্তরে বলিলেন,

يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وأتوبه من اختلاف الناس، فدع الناس وما اختار أهل بلد منهم لانفسهم !

"আমীরুল মু'মেনীন! আপনি কদাচ এরূপ কার্য করিবেন না। কারণ "মুআত্তা" সংকলিত হইবার পূর্বেই বিভিন্ন উক্তি জনগণের হস্তগত হইয়াছে এবং তাঁহারা হাদীসসমূহ শ্রবণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন রেওয়ায়ত বিদ্বানগণ বর্ণনা করিয়াছেন, যেরূপ উক্তি যে দলের হস্তগত হইয়াছে, তাঁহারা তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন, এই ভাবে ব্যবহারিক বিষয়সমূহে বিদ্বানগণের মতভেদ জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতএব প্রত্যেক নগরের অধিবাসীবৃন্দ তাহাদের জন্য যে যাহা অবলম্বন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগকে সেই অবস্থাতেই থাকিতে দিন।"

শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আর একটি বর্ণনা সূত্রে খলিফা হারুনর রশীদও ইমাম মালিকের নিকট তাঁহার গ্রন্থ 'মুআত্তাকে' পবিত্র কা'বার প্রাচীর গাত্রে ঝুলাইয়া দিবার এবং জনমণ্ডলীকে উহার অনুসরণে বাধ্য করার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। ইমাম সাহেব তদুত্তরে হারুনর রশীদকে বলেন,

لاتفعل، فان أصحاب رسول الله عليه وسلم اختلفوا فى الفروع وتفرقوا فى البلدان وكل سنة مضت قال : وفق الله يا ابا عبد الله !

আপনি এরূপ করিবেন না, কারণ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীগণের মধ্যে ব্যবহারিক বিষয়সমূহে মতভেদ ঘটিয়াছিল আর এইভাবেই তাঁহারা বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন! তাঁহাদের সমুদয় মতভেদ অতিক্রান্ত সুন্নাতরূপে পরিগৃহীত! খলিফা হারূন বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনার মহানুভবতাকে আল্লাহ বর্ধিত করুন" [হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা ১৫০ পৃষ্ঠা]।

নির্দিষ্ট কোন মযহবে জনমণ্ডলীকে সমবেত হইবার জন্য বাধ্য করা জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও গবেষণার পক্ষে হানিকর, হারুনর রশীদও যে তাহা বুঝিতেন, তাঁহার শেষ কথায় ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মনসুর ও হারূন ইমাম সাহেবকে শুধু পরীক্ষা করার জন্যই তাঁহার সম্মুখে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা একদিকে যেমন ইমাম মালিকের জ্ঞানের প্রখরতা ও তদীয় গ্রন্থ 'মুআত্তার' গৌরব গরিমা প্রতিপন্ন হইতেছে, তেমনি ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে,

ইমাম মালিক তাঁহার মযহবে জনসাধারণকে সমবেত করার কার্যে সম্মতি দেন নাই, অথচ একথা প্রণিধানযোগ্য যে, মুআত্তা ফিকহ শাস্ত্রের অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস হইতে প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তসমূহের গ্রন্থ নয়, উহা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস ও সাহাবীগণের আসার সমূহের সমষ্টি মাত্র। যেহেতু তখন পর্যন্ত দেশ দেশান্তরে সম্প্রসারিত সাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত সমুদয় হাদীস সংকলিত ও সুসম্পাদিত হয় নাই এবং বিভিন্ন নগর নগরীতে সাহাবা ও তাবেয়ীগণ যে সকল ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন সেগুলিকে একত্রিত ও পরীক্ষিত করা তখনও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই, -তাই শুধু নিজের সংকলিত হাদীসগুলির উপর নির্ভর করা এবং অন্যান্য হাদীসসমূহ প্রত্যাখ্যান করার কার্য ইমাম সাহেব সমীচীন বোধ করেন নাই।

পরবর্তীকালে মুআত্তার উপর নির্ভর করিয়া মালিকী আর উমরের উপর আস্থা পোষণ করিয়া শাফেয়ী, জামে'কবীর, সগীর ও মবসূত প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া হানাফী ইত্যাদি মযহবসমূহ যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইমাম মালিকের উল্লিখিত অনুসরণীয় নীতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য বিধানের কোনই উপায় নাই।

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধা

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের প্রতি ইমাম মালিকের অনাবিল শ্রদ্ধার বিবরণ পাঠকগণ ইতিপূর্বে শ্রবণ করিয়াছেন, এক্ষণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি ইমাম সাহেবের সীমাহীন ও গভীরতম ভক্তির পরিচয় তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের একটি আচরণ হইতে গ্রহণ করুন। দুর্বলতা ও বার্ধক্য সত্ত্বেও ইমাম সাহেব তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত মদীনার বুকে কোন দিন কোন যানবাহনে আরোহন করেন নাই। কেহ বিশেষভাবে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন,

لاار كب فى مدينة فيها جثـة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة

যে মদীনার মাটির নীচে, রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র দেহ সমাহিত রহিয়াছে, সেই মদীনার বুকের উপর আমি কোন যানবাহনে উঠিতে পারি না [ইবনে খল্লকান (১) ৪৪৯ পৃঃ; শযরাতুয্ যহব (১), ২৮৯ পৃঃ)

محمد عربى كابروي هردو سر است
كيسكه خاك درش نيست خاك برسرو!

মুহাম্মদ আরাবী (সা) উভয় জগতের আবরু, যে তাঁর দুয়ারের মাটি নয়, তার কপালে মাটি!

মৃত্যু শয্যায় ইমাম

হাফেয হুমায়দি "জযওয়াতুল মুকতাবিস" গ্রন্থে ইমাম মালিকের অন্যতম ছাত্র আবদুল্লাহ বিনে মুসলিমা কাআনবীর প্রমুখাৎ বিবৃত করিয়াছেন যে, ইমাম মালিকের মৃত্যু শয্যায় আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করি। সালামের পর আমি তাঁহার শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া দেখিতে পাই, তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। আমি আরয করিলাম, আবু আবদুল্লাহ, আপনি কাঁদিতেছেন কিসের জন্য? ইমাম সাহেব আমাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন ঃ

يا ابن قعنب، مالى لأبكى ومن أحق بالبكاء منى؟ والله لوددت أنى ضربت بكل مسئلة أفتيت فيها برأنى بسوط سوط، وقد كانت لى السعة فيها قد سبقت إليه وليتنى لم أفت بالراى !

ওগো কাআনবের পুত্র, আমি কাঁদিব না কেন? আমি যদি না কাঁদি, তাহা হইলে আর কাঁদিবে কে? আল্লাহর শপথ! আমি যতগুলি ফতওয়া কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া স্বীয় ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির সাহায্যে প্রদান করিয়াছি, সেগুলির প্রত্যেকটির বিনিময়ে এক একটি করিয়া কোড়ার আঘাত সহ্য করা আমার পক্ষে উত্তম ছিল। অথচ এরূপ ফতওয়ায় নিরস্ত্র থাকা আমার সাধ্যাতীত ছিল না! হায় দুর্ভাগ্য! যদি ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া আমি ফতওয়া প্রদান না করিতাম! [ইবনে খল্লকান (১), ৪৩৯ পৃঃ]।

ইমাম মালিকের এই ন্যায়নিষ্ঠা এবং কুরআন ও হাদীসকে যাবতীয় সমস্যার সমাধান কল্পে অনুসরণ করার রীতি তাঁহাকে হাদীস পন্থীগণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং ইহার ফলেই উত্তরকালে তিনি আহলে রায় ও আহলে হাদীস উভয় দলের সেতুবন্ধনে পরিণত হইয়াছিলেন।

ইমাম সাহেবের ছাত্রমণ্ডলী

ইমাম মালিকের প্রমুখাৎ যাঁহারা হাদীস শ্রবণ করিয়াছিলেন, অথচ যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং জ্ঞান-গরিমায় তাঁহার তুলনায় নিকৃষ্টও ছিলেন না, পক্ষান্তরে যাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইমাম মালিকের উসতাযও ছিলেন, এরূপ বিদ্বানের সংখ্যা মুষ্টিমেয় নয়। ছাত্রের প্রচলিত অর্থ সূত্রে এই সকল বিদ্যাবিশারদকে ইমাম মালিকের ছাত্র বলা চলে না কিন্তু রেওয়ায়তে হাদীসের দিক দিয়া মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় ইহারাও ইমাম সাহেবের ছাত্ররূপে অভিহিত হইয়াছেন। হাফেয ইবনে আবদুল বর নিম্নলিখিত বিদ্যা-মহার্ণবগণকে ইমাম মালিকের উল্লিখিত শ্রেণীর ছাত্ররূপে গণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদ আল আনসারী, আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ বিনে আবদুর রহমান ইবনে

নওফল আল আসাদী আল কুরয়াশী, যিয়াদ বিনে সাদ খুরাসানী, ইমাম আবু হানীফা নু'মান বিনে সাবিত কুফী, সুফয়ান সওরী, সুফয়ান বিনে উআয়না, শো'বা বিনুল হাজ্জাজ, ইমাম আওযায়ী, ইমাম লয়েস বিনে সাদ মিস্‌রী। ইহাদের মধ্যে সুফয়ান বিনে উআয়না ব্যতীত অন্য সকলেই ইমাম মালিকের জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন [আল্ ইন্‌তিকা, ১২ পৃষ্ঠা]।

আর যাঁহারা প্রকৃতই ইমাম সাহেবের নিকট হইতে বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলেন, হাফেয দারুকুতনী স্বীয় গ্রন্থে তাঁহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক নির্ণয় করিয়াছেন। আমরা এই জনসমুদ্র হইতে মাত্র কয়েক জনের নাম নিম্নে উল্লেখ করিতেছি- আবদুল্লাহ বিনুল মুবারক, ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদ আল কাত্তান, আবদুর রহমান বিনে মহ্‌দী, ইবনে ওয়াহ্‌হাব, ইবনুল কাসেম, কাআ্‌নবী, আবদুল্লাহ বিনে ইউসুফ, সঈদ বিনে মনসুর, ইয়াহয়া বিনে ইয়াহয়া নেশাপুরী, ইয়াহয়া বিনে ইয়াহ্‌য়া অন্দুলুসী, ইয়াহ্‌য়া বিনে বুকাই, কোতায়বা, আবু মস্‌অব যুবায়রী, আবু হুযায়ফা সহ্‌মী, মুহাম্মদ বিনুল হাসান শয়বানী ও ইমাম মুহাম্মদ বিনে ইদ্‌রীস শাফেয়ী।

ইমাম মালিকের ছাত্রমন্ডলীর তালিকা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে একটি চমৎকার ব্যাপার পরিলক্ষিত হইবে। অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আহ্‌লে সুন্নাতগণের মধ্যে প্রচলিত প্রসিদ্ধতম মযহবগুলির উদ্ভব কেন্দ্ররূপে ইমাম মালিক পরিগণিত হইয়াছেন। ইরাকের ফকীহগণের অধিনায়ক ইমাম আবু হানীফাকে যেরূপ ইমাম মালিকের রেওয়ায়তে হাদীসের ছাত্র মন্ডলীতে দেখা যাইতেছে- ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বলের উস্‌তায ইমাম শাফেয়ীও সেইরূপ ইমাম মালিকের ছাত্রদলে দৃশ্যমান হইতেছেন। ইমাম আবু হানীফাকে বাদ দিলেও হানাফী মযহবের সংকলিয়তা ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসান যে ইমাম মালিকের প্রত্যক্ষ এবং বিশিষ্ট ছাত্র, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নাই। সুতরাং তাঁহার সাগর তীর্থে হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও যাহেরী সমুদয় আহলে মযহবকে আসিয়া মিলিত হইতে হইয়াছে- রাযিয়াল্লাহু আনহু।

ইমামুল আয়েম্মা শাফেয়ী মুত্তালবী

الشافعی إمام كل أئمة ـ ترى فضائله على الألاف ! ختم النبوة
والإمامة فى الهدى بمحمدين هما لعبد مناف ! [2]

নাম ও বংশ পরিচয়

মুহাম্মদ বিনে ইদরীস বিনে আব্বাস বিনে উসমান বিনে শাফেঅ্‌ বিনুস সায়েব বিনে উবায়দ বিনে আব্দে ইয়াযীদ বিনে হাশেম বিনুল মুত্তালিব বিনে আব্দে মনাফ বিনে কুসাই বিনে কিলাব আল-কুরায়শী আল মুত্তালবী। ইমাম শাফেয়ীর অন্যতম প্রপিতামহ সায়েব বিনে উবায়দ বদর যুদ্ধে কাফের দলের পক্ষে বনি হাশেমদের পতাকাধারী ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় মুসলিম বাহিনীর নিকট ধরা দেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র হস্তে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম সাহেবের উর্ধতন পুরুষ আব্দে মনাফ এবং রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্ব পুরুষ আব্দে মনাফ অভিন্ন ব্যক্তি। অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যে অন্য কেহই এই গৌরবের অধিকারী হন নাই। ইমাম শাফেয়ীর জননী আযদ গোত্রের জনৈকা মহিয়সী নারী ছিলেন।

ইমামের জন্ম

ইহা অবিসম্বাদিত যে, ইমাম শাফেয়ী ইমামে আযমের মৃত্যু সনে অর্থাৎ ১৫০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্ম স্থান সম্বন্ধেবিভিন্ন রূপী রেওয়ায়ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন রেওয়ায়ত সূত্রে তিনি আস্‌কালানে ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন, আবার অন্যান্য বর্ণনা অনুসারে ইমাম সাহেব গাযায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কেহ বলেন, গাযা ইয়ামানের অন্তর্গত, আবার কেহ বলেন, উহা সিরিয়ায় অবস্থিত।

---

[2] শাফেয়ী সমুদয় ইমামের অধিনায়ক, তাঁহার গৌরব হাজার হাজার বিদ্বানকে অতিক্রম করিয়াছে। নবুওত আর সঠিক পথের ইমামত দুইজন মুহাম্মদে নিঃশেষিত হইয়াছে আর সে দুইজনই আব্দে মনাফ গোত্রের! অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর (সা) ন্যায় ইমাম শাফেয়ীও আব্দে মনাফ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামও মুহাম্মদ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বারা কুরআন ও সুন্নতের সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে যেরূপ নবুওতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, কবির কল্পনায় ইমাম শাফেয়ীর দ্বারাও তেমনি হিদায়াতের ইমামত শেষ হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় মহাবিদ্বান ও পথপ্রদর্শক অতঃপর আর কেহই জন্মগ্রহণ করিবে না। কবির কল্পনার পিছনে কুরআন ও সুন্নতের কোন প্রমাণ বিদ্যমান না থাকিলেও ঐতিহাসিক ভাবে এযাবৎ এই ধারণার ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয় নাই।

মক্কায় আগমন

ইমাম সাহেব তাঁহার দুই বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃহীন হন। তাঁহার জননী শাফেয়ীর বংশ গৌরব যাহাতে ক্ষুন্ন না হয় তজ্জন্য শিশু পুত্র সমভিব্যবহারে মক্কায় চলিয়া আসেন এবং জনৈক কুরায়শী জ্ঞাতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাফেয়ী কুরায়শীদের মধ্যে থাকিয়া প্রতিপালিত এবং স্বীয় উর্ধতন পুরুষগণের গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হন, এই আশাতেই তাঁহার মহিয়সী জননী তাঁহাকে মক্কায় বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। জননীর আশা যে সার্থক হইয়াছিল একথা বলা বাহুল্য। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শাফেয়ীর জননী মাঝে মাঝে মক্কায় বাহিরেও তাঁহাকে লইয়া যাইতেন কিন্তু অতঃপর তিনি স্থায়ী ভাবে মক্কায় রহিয়া যান। ৭ বৎসর বয়সে শাফেয়ী কুরআন আর ১০ বৎসর বয়সে ইমাম মালিকের মুআত্তা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন।

ইমাম শাফেয়ীর উসতাযগণ

ইমাম শাফেয়ীর বহু সংখ্যক উসতাযের মধ্যে তাঁহার চাচা মুহাম্মদ বিনে আলী বিনে শাফেঅ, ইবরাহীম বিনে আবি ইয়াহ্য়া সউদ, ইসমাঈল বিনে কস্‌তন্‌তীন্, ইসমাঈল বিনে জা'ফর, দাউদ বিনে আবদুর রহমান, আবদুল আযীয দরাওয়ার্দী, ইবরাহীম বিনে আবি ইয়াহ্য়া, আবদুর রহমান মলীকী, আবদুল্লাহ মখযুমী, ইবরাহীম বিনে আবি মহযুরা, আবদুল্লাহ বিনুল হারেস মখযুমী, মুহাম্মদ বিন আবি ফুদয়ক, আবদুল মজীদ বিনে আবি রাউয়াদ, মুহাম্মদ বিনে উসমান জমহী, সঈদ বিনে সালেম কদ্দায়া, ইয়াহয়া বিনে সলিম তায়েফী, হাতেম বিনে ইসমাঈল, মুতাররফ বিনে মাযেন, হিশাম বিনে ইউসুফ, ইয়াহ্য়া বিনে আবি হাস্‌সান, আবদুল ওয়াহ্‌হাব সকফী, ইসমাঈল বিনে আলীঈয়া, মুসলিম বিনে খালিদ যন্‌জী, আবদুল আযীয বিনুল মাজেশুন, মুহাম্মদ বিনুল হাসান শয়বানী, সুফয়ান বিনে উআয়না ও ইমাম মালেক সমাধিক প্রসিদ্ধ।

কিরআত বিদ্যায় পারদর্শিতা

মক্কার বিখ্যাত ক্বারী ইসমাঈল বিনে কস্‌তন্‌তীনের নিকট হইতে কিরআতের বিদ্যায় শাফেয়ী অতুলনীয় দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। রামাযানের তারাবীহে তিনি ৬০ বার কুরআন সমাপ্ত করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর এমন সুমধুর এবং পাঠভংগী এত হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, বাহ্‌র বিনে নসর বলেন, আমরা যখন কাঁদিতে ইচ্ছা করিতাম তখন পরস্পর বলাবলি করিতাম, চল, আমরা সেই মুত্তলবী নওজওয়ানের কাছে গিয়া কুরআন শ্রবণ করিয়া আসি। অতঃপর আমরা শাফেয়ীর নিকট সমবেত হইতাম এবং তিনি কুরআন মজীদের কিরআৎ আরম্ভ করিয়া দিতেন, তাঁহার সম্মুখে শ্রোতারা অজ্ঞান হইয়া পতিত হইতেন এবং

তাঁহার সুমধুর ও উদাত্ত কণ্ঠের কুরআন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া যাইত।

স্মৃতি ও অধ্যবসায়

স্মরণ শক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ হওয়া সত্ত্বেও অধিকতর স্মৃতি শক্তি লাভ করার জন্য লোবান ব্যবহার করার ফলে শাফেয়ী অর্শ্বরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অসামান্য স্মৃতিধর হইয়াও ইমাম শাফেয়ী কাপড় ও চামড়ায় হাদীস লিখিয়া লইতেন। দারিদ্র নিবন্ধন কাগজ কিনিতে অক্ষম হওয়ায় অনেক সময়ে সরকারী দফতরের পরিত্যক্ত কাগজের শূন্য পৃষ্ঠায় হাদীস লিপিবদ্ধ করিতেন।

সাহিত্যিক পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা

ইমাম শাফেয়ী প্রথমেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইসলামী ফিকহ, সুন্নত ও কুরআনে বিশেষজ্ঞের আসন অধিকার করিতে হইলে আরবী সাহিত্যে ও সাহিত্যিকতায় অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত তিনি আরব বেদুইনদের মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, হুযায়লদের দশ সহস্র কবিতা সঠিক উচ্চারণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি সহকারে ইমাম সাহেবের কণ্ঠস্থ ছিল। প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও আভিধানিক আসমায়ী (১২২-২১৬) ইমাম শাফেয়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও হুযায়লীদের কবিতা তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,

قرأت شعر الشنفرى الأزدى على محمد بن إدريس الشافعى -

আমি শনফরা আযদীর কবিতামালা মুহাম্মদ বিনে ইদরীস শাফেয়ীর নিকট পাঠ করিয়াছি। মুতাযেলাদের ইমাম স্বনামধন্য সাহিত্যিক জাহেয বলেন,

نظرت فى كتب هؤلاء النابغة الذين نبغوا اتبعوا فى العلم يعنى أهل السنة فلم أر أحسن تأليفا من المطلبى، كان لسانه ينظم الدرر !

আমি এই সকল অনুসরণজীবী অর্থাৎ আহলে সুন্নতদের গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, মুত্তলবী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক আর কেহই নাই। তাঁহার ভাষা যেন মুক্তার মালা গাঁথিয়া যাইতেছে।

কুরআন মজীদের সূরা আননিসার আয়াতে কথিত ঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ لَّاتَعُوْلُوْا

বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসংগে মু'তাযেলী হানাফী ইমাম আল্লামা যমখ্‌শরী (৪৬৭-৫৩৮) তাঁহার "কাশশাফে" ইমাম শাফেয়ী কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন,

وكلام مثل الشافعی من أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤس المجتهدين حقيق بأن يحمل على الصحة والسداد و كان أعلى كبا و أطول باعافى كلام العرب ـ

"শাফেয়ীর ন্যায় বিশ্বজ্জনমণ্ডলীর মুখপাত্র, শরীয়তের ইমাম, মুজতাহিদগণের শিরোমণি ব্যক্তির প্রদত্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক ও অভ্রান্ত মনে করা উচিত। আরবী সাহিত্যে তিনি অসাধারণ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ মাযেনী (-২৪৯), আভিধানিক স'লব (২০০-২৯১) ও আযহারী (২৮২-৩৭০) সাক্ষ্য দিয়াছেন যে,

قول محمد بن إدريس حجة فى اللغة ـ

মুহাম্মদ বিনে ইদরীস (শাফেয়ীর) উক্তি অভিধানের দিক দিয়া অথরিটি বা প্রামাণ্য।

লক্ষ্যভেদে অসাধারণত্ব

আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ ও অভিধানের ন্যায় ইমাম শাফেয়ী শর সন্ধানেও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। একদিন ছাত্র ও বন্ধু বান্ধব পরিবেষ্টিত মজলিসে তিনি বলিতে ছিলেন, আমার ষোলআনা মনোযোগ বাল্যে ও যৌবনে তীর কামান শিক্ষা করার ও বিদ্যা অর্জনের কার্যে নিবিষ্ট ছিল, তীর নিক্ষেপ করার কার্যে আমি এরূপ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলাম যে, আমার নিক্ষিপ্ত দশটি তীরের মধ্যে একটিও লক্ষ্যচ্যুত হইত না। ইমাম সাহেব তীর কামানে তাঁহার দক্ষতার কথা বলিলেন বটে কিন্তু নিজের জ্ঞান গরিমা সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। মজলিসে সমাগত জনৈক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহর শপথ! বিদ্যার গরিমায় আপনি তীর কামানের নৈপুন্যকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

মদীনায় আগমন

মক্কার গুণী ও সুধিবৃন্দের নিকট হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইমাম সাহেব ১৬৩ হিজরীতে মদীনার ইমাম মালিক বিনে আনসের নিকট উপস্থিত হন। শাফেয়ী স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি ইমাম মালিক কর্তৃক ক্লাসে শরীক হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পরবর্তী দিবসের দরসের হলকায় যোগদান করিলাম মোয়াত্তা আমার হাতেই ছিল, আমি উচ্চকণ্ঠে উহা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম কিন্তু আমি ইমাম মালিকের প্রতাপে স্তব্ধ হইয়া গেলাম এবং আবৃত্তি শেষ করিতে উদ্যত হইলাম। ইমাম মালিক আমার আবৃত্তির সৌন্দর্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হে জওয়ান, পড়িতে থাক। আবৃত্তি বন্ধ করিও না। ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমি এই ভাবে কয়েক দিবস পর্যন্ত মুওয়াত্তা আবৃত্তি করিতে থাকিলাম। ১৯৭ হিজরীতে ইমাম মালিকের ওফাত হয়, ইমাম শাফেয়ী উসতাযের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার সাহচর্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নাই, মাঝে মাঝে মাতৃ দর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় এবং দেশ পর্যটনের জন্য বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতেন।

চাকুরী জীবন

দারিদ্রের কবলে নিস্পেষিত হইতে থাকায় অতঃপর ইমাম সাহেবকে অর্থোপার্জনের কার্যে মনোনিবেশ করিতে হইল। ইয়ামানের শাসনকর্তা তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান গরিমার ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে ইয়ামানে একটি সরকারী চাকুরী দিতে সম্মত হন। ইমাম সাহেব তখন এরূপ সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পাথেয় সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে তদীয় মাতার বাস গৃহ বন্ধক রাখিতে হইয়াছিল। মোটের উপর তিনি ইয়ামানে প্রথমতঃ একটি সরকারী কার্যে নিয়োজিত এবং কিছুকাল পরেই ইয়ামানের অন্তর্গত নজরানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। চাকুরী এবং শাসন কর্তৃত্বের কার্য উপলক্ষে বহু ফকীহ, মুহাদ্দিস ও বিদ্বান ব্যক্তির সহিত তাঁহার যোগাযোগ স্থাপনের পথ সুগম হইল, তাঁহার গভীর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার কথা দূরদূরান্তর ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু একদল বিদ্বান তাঁহাকে চাকুরী পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিতে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বুঝাইতে ছিলেন যে, চাকুরীর জন্য বিদ্যাকে সৃষ্টি করা হয় নাই।

বিদ্রোহের অভিযোগ

ইতিমধ্যে এমন কতকগুলি ব্যাপার সংগঠিত হইল যাহার ফলে ইমাম শাফেয়ী খলীফা হারুণের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইলেন। ইমাম সাহেব স্বয়ং লিখিয়াছেন, "আমি যখন নজ্রানের শাসকর্তা নিযুক্ত হই, তখন উক্ত অঞ্চলে বনু হারিস ও বনু সকিফের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসেরা বসবাস করিত। কোন নূতন ব্যক্তি শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া নজ্রানে আগমন করিলে এই মাওয়ালীর দল (কৃতদাসগণ) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নানা রূপ চাটুকারিতা ও স্তবস্তুতির সাহায্যে তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টিত হইত। কিন্তু আমার কাছে সমবেত হইবার তাহারা সুবিধা পায় নাই"। ইতিমধ্যে নূতন একজন লোক ইয়ামানের গভর্ণর হইয়া আসে। এই লোকটি অত্যন্ত বদ-মেজাজ ও অত্যাচারী ছিল। তাহার অত্যাচারের হস্ত হইতে নজরানের অধিবাসীবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য ইমাম শাফেয়ী বদ্ধপরিকর হইলেন এবং উহার অত্যাচারের প্রতিরোধকল্পে তিনি তাহার কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা শুরু করিয়া দিলেন।

আব্বাসীরা হযরত আলীর বংশধরদের সাহায্যেই খিলাফতের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন, কিন্তু গদ্দী অধিকার করার পর তাহারা আলাব্বীদিগকেই নিজেদের সর্বাপেক্ষা বড় দুশমন ভাবিতে আরম্ভ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) আত্মীয়তার দাবীতেই আব্বাসী খলীফারা সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, আর আলাব্বীরা আত্মীয়তার দাবীর দিক দিয়া রাসূলুল্লাহর (সা) অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন, ফলে আব্বাসী সম্রাটগণ আলাব্বীদিগকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করিয়া তাঁহাদের নিধনকল্পে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিলেন। ইয়ামানের শাসনকর্তা ইমাম শাফেয়ীর ক্ষুরধার সমালোচনার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য খলীফা হারুনুর রশীদকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মুহাম্মদ বিনে ইদরীস নামক জনৈক শাফেয়ী মওলবী আলাব্বী বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই লোকটির রসনা যে কার্য করিতে সক্ষম অন্য কাহারও তরবারি তাহা করিতে সক্ষম নয়। হারুন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ৯জন বিদ্রোহী আলাব্বীকে ইমাম শাফেয়ী সমভিব্যবহারে বাগদাদের দরবারে প্রেরণ করিবার ফর্মান জারি করিলেন। ইমাম শাফেয়ীকে খলীফা হারুনুর রশীদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে খলীফা তাঁহার বিরুদ্ধে আব্বাসী খিলাফতের অবসানকল্পে আলাব্বীদের সহিত ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং তাঁহার আচরণের কৈফিয়ত চান। ইমাম সাহেব অভিযোগের জওয়াবে বলেন, আমীরুল মুমেনীন! আচ্ছা বলুন দেখি, দুইজন লোকের মধ্যে একজন আমাকে তাহার ভাই মনে করে আর অপর ব্যক্তি আমাকে

তাহার ক্রীতদাস ধারণা করে, এতদুভয়ের মধ্যে আমার প্রীতিভাজন হইবে কে? খলীফা বলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে ভাই মনে করিয়া থাকে স্বভাবতঃ সেই আপনার প্রীতিভাজন হইবে। শাফেয়ী বলিলেন, আমিরুল মুমেনীন! ইহাই আপনার অভিযোগের জওয়াব। আপনি হযরত আব্বাসের আর আলাব্বীরা রাসূলুল্লাহর (সা) জামাতা হযরত আলীর বংশধর। আমি মুত্তালিবের বংশধর! আপনারা আমাদিগকে আপনাদের ভ্রাতা বিবেচনা করেন, কিন্তু আলাব্বীরা আমাদিগকে তাহাদের দাস ধারণা করিয়া থাকে।

ইমাম ইবনে আবদুল বর এবং ইবনুল ইমাদ তাঁহাদের গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হারুন তখন বাগদাদের অন্তঃপাতী রক্কা নামক নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত নগরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন আবু হানীফার বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসান শয়বানী। তিনি শাফেয়ীর সুহৃদ ছিলেন এবং যাঁহাদের কাছে শাফেয়ী বিদ্যালাভ করার জন্য উপবেশন করিয়াছিলেন, ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসান তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ইমাম সাহেব হিজায হইতে ৯ জন আলাব্বীর সহিত রাজদ্রোহের অভিযোগে শৃংখলাবদ্ধ হইয়া মক্কায় নীত হন। অন্য একটি রেওয়াত সূত্রে শাফেয়ী কতিপয় কুরায়শী সমভিব্যবহারে জনৈক আলাব্বীর সহিত বিদ্রোহ সৃষ্টি করার অভিযোগে ধৃত হইয়া শৃংখলিত অবস্থায় মক্কা হইতে রক্কায় হারুনের সম্মুখে নীত হন, হারুনুর রশীদ ইমাম শাফেয়ীকে মক্কার কুরায়শী দলের মুখপাত্র স্বরূপ কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করিলে শাফেয়ী উপরিউক্ত মন্তব্য করিয়া ছিলেন। হারুন তাঁহার জওয়াবে সন্তুষ্ট হইয়া সমুদয় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৫ শত সুবর্ণ মুদ্রা এবং শাফেয়ীকে পৃথক ভাবে পঞ্চাশ সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করার আদেশ দিয়া মুক্তি দেন। কিন্তু অপর রেওয়ায়ত অনুসারে হারুন ৯ জন আলাব্বীকেই নিহত করিয়াছিলেন। আর ইমাম শাফেয়ী জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি জওয়াব দিয়াছিলেন যে, আমি তালেবী (আবুতালেবের বংশধর) অথবা আলাব্বী (হযরত আলীর বংশধর) এতদুভয়ের কোনটাই নই। আমাকে যবরদস্তী এই দলের সংগে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি আব্দে মানাফের পুত্র মুত্তালিব বংশীয়। [রাসূলুল্লাহর (সা) প্রপিতামহ হাশিমের ভ্রাতা, মুত্তালিবের পুত্র হাশিম আর রাসূলুল্লাহর (সা) প্রপিতামহ হাশেম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি।]

এতদ্ব্যতীত আমি কিছু বিদ্যাবুদ্ধিও রাখি, ফিক্হ শাস্ত্রও অবগত আছি। আপনার কাযী অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসান আমাকে চিনেন, আমার নাম মুহাম্মদ বিনে ইদরীস! তখন ইমাম মুহাম্মদও শাফেয়ীকে সমর্থন করেন এবং তাঁহার জ্ঞান গরিমা ও বিদ্যাবত্তার কথা খলীফা হারুনের নিকট ব্যক্ত করেন।

হারূনুর রশীদ সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া ইমাম শাফেয়ীকে ইমাম মুহাম্মদের সংগে যাইতে দেন। এই ব্যাপার ১৮৪ হিজরীতে অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীর ৩২ বৎসর বয়সে ঘটিয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম শাফেয়ীর বৈশিষ্ট্য

ইমাম মালিক (র) যেরূপ মদনী ও কুফী বিদ্যার উদ্ভব কেন্দ্র ছিলেন, সেইরূপ ইমাম শাফেয়ীর মধ্যে মদনী ও কুফী অর্থাৎ হাদীস ও রায় উভয় বিদ্যা সংগম লাভ করিয়াছিল। হাফেয ইবনে হজর আসকালানীর ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, "মদনী ফিক্‌হের সার্বভৌমত্ব ইমাম মালিকের ভিতর নিঃশেষিত হইয়াছিল, ইমাম শাফেয়ী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব বরণ করিয়া ইমাম মালিকের সমুদয় বিদ্যার ধারক হইয়াছিলেন। আবার ইরাকী ফিক্‌হের একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব ইমাম আবু হানিফার মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিয়াছিল। ইমাম শাফেয়ী তাঁহার সন্দর্শন লাভ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট ছাত্র যিনি ইমাম মালিকেরও অন্যতম ছাত্র ছিলেন সেই ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসানের নিকট হইতে ইরাকী ফিক্‌হের সমস্তই শ্রবণ করিয়াছিলেন। ফলে ইমাম শাফেয়ীর মধ্যে আহলে হাদীস ও আহলে রায় উভয় দলের বিদ্যার সমাবেশ হইয়াছিল এবং এ বিষয়ে তাঁহার পক্ষ ও প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

ইমাম শাফেয়ী স্বয়ং বলিয়াছিলেন

لقد كتبت عن محمد وقر بعير ولو لاه ما امنفتق لى من العلم مافتق -

"আমি মুহাম্মদ বিনুল হাসানের নিকট হইতে উষ্ট্রের বোঝা পরিমাণ বিদ্যা সংকলিত করিয়াছিলাম এবং যদি তিনি না হইতেন তাহা হইলে আমার বিদ্যা যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সেরূপ করিত না, -শযরাতুযযহব (১) ৩২৩ পৃঃ।

ইমাম মুহাম্মদ ইমাম শাফেয়ীকে যেরূপ ইরাকের বিদ্যায় সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার অভাব অভিযোগেও সকল সময়ে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন। ইমাম মুহাম্মদ স্বীয় উসতায ভাই ও গৌরবান্বিত ছাত্রকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। একদা খলীফার দরবারে গমন করার জন্য কাযী মুহাম্মদ বিনুল হাসান অশ্বারোহণ করিয়াছিলেন এমন সময়ে ইমাম শাফেয়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করা মাত্র ইমাম মুহাম্মদ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় খাদিমকে বলিলেন, যাও, খলীফার কাছে গিয়া বল, আমার পক্ষে এখন উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হইল না; শাফেয়ী স্বীয়

উসতাযকে বলিলেন, আমি অন্য সময় উপস্থিত হইলেই চলিবে। ইমাম মুহাম্মদ বলিলেন, তাহা হইতে পারে না। এই কথা বলিয়া তিনি শাফেয়ীর হস্ত ধারণ পূর্বক স্বীয় বাসভবনে প্রবেশ করিলেন।

মক্কায় প্রত্যাবর্তন

কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হে মদীনা, ফিক্‌হে ইরাক, আরাবী সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস, রিজাল প্রভৃতি বিদ্যায় আপন যুগের বিদ্বানগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ইমাম শাফেয়ী মক্কায় প্রত্যাবর্তিত হন। মক্কায় হজ্জের মওসুমে ইসলাম জগতের সকল প্রান্ত হইতে সমস্ত দলের বিদ্বান, ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ সমবেত হইতেন। মুসলিম জগতের এই নাভিস্থল হইতে ইমাম শাফেয়ীর যশো-সৌরভ মৃগনাভির ন্যায় পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িল, এই স্থানেই ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ও ইসহাক বিনে রাহওয়ে প্রভৃতির ন্যায় বিদ্বানগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

ইসহাক বিনে রাহওয়ে বলিতেছেন, একদা আমরা সুফয়ান বিনে উআয়নার দর্সে আম্র বিনে দীনারের হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম, এমন সময় আহমদ বিনে হাম্বল আসিয়া আমাকে বলিলেন,

تعال حتى أذهب بك إلى من لم تر عيناك مثله -

"চল আবু ইয়াকুব, আমি তোমাকে লইয়া এমন একজন লোকের নিকট যাইব যাঁহার তুল্য কোন ব্যক্তিকে তোমার চক্ষু কোনদিন দর্শন করে নাই।" আমি তাঁহার কথা শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলাম, তিনি আমাকে ইমাম শাফেয়ীর দর্সের হলকায় লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার বিদ্যার গভীরতা এবং স্মৃতিশক্তির প্রখরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। ইমাম আহমদ বলিলেন, হে আবু ইয়াকুব, ইহার নিকট হইতে যাহা পার শিখিয়া লও, কারণ ইহার তুল্য কোন ব্যক্তি আমি দর্শন করি নাই। ইমাম শাফেয়ী মক্কায় ৯ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করেন, ইতিমধ্যে তাঁহার যশোভাতি মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে।

বাগদাদে প্রবেশ

সর্বজনমান্য বিশ্ব-বিশ্রুত মহাবিদ্বান রূপে সর্ব প্রথম ১৯৫ হিজরীতে ইমাম শাফেয়ী ইসলাম জগতের তৎকালীন কেন্দ্র-ভূমি বাগদাদে প্রবেশ করেন। তখন তিনি ইসলামী ফিক্‌হের একটি নিজস্ব স্কুল প্রতিষ্ঠা করার যোগ্যতা অর্জন

করিয়াছিলেন। বাগদাদে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দারুল খিলাফতের ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক তিনি পরিবেষ্টিত হইলেন। খলীফার গোষ্ঠির বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও শাফেয়ীর বিদ্যাবত্তার প্রভাবে নতশীর হইলেন। তিনি এ যাত্রায় দুই বৎসর বাগদাদে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় ইমাম আবু সওর বাগদাদী, ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল, হাসান বিনে মুহাম্মদ সবাহ যাআফরানী ও আবু আবদুর রহমান প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাগদাদের তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম হাদীসতত্ত্ববিশারদ আবদুর রহমান বিনে মহদী ইমাম শাফেয়ী অপেক্ষা পনের বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের সাহায্যে মসআলা প্রতিপাদন করার রীতি এবং নাসেখ,-মনসুখ ও অমূম নসুসের পরিচয় লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন। ইবনে মহ্দীর অনুরোধ ক্রমেই ইমাম শাফেয়ী 'কিতাবুর রিসালা' নামক তাঁহার যুগান্তকারী পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। শাফেয়ীর "কিতাবুল হুজ্জাত"ও এই সময়ের লিখিত গ্রন্থ। দুই বৎসর পর্যন্ত বাগদাদে অবস্থান করার পর ইমাম শাফেয়ী মক্কায় প্রত্যাবর্তিত হন।

বাগদাদে পুনঃ প্রবেশ ও মিসর

১৯৮ হিজরীতে ইমাম শাফেয়ী পুনরায় বাগদাদে আগমন করিলেন, কিন্তু তখন হারুনুর রশীদের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তদীয় পুত্র মামুন ভ্রাতা আমীনের রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত করিয়া খিলাফতের সিংহাসনে অধিরোহন করিয়াছিলেন। আমীনের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবীয় শক্তি দণ্ডায়মান হইয়াছিল। আর মামুনের প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহার চতুস্পার্শে তদানীন্তন পারসিক শক্তির সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ফলে আমীনের পরাজয় দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী খিলাফতে আরবীয় প্রভাবেরই অবসান সূচিত হইয়াছিল।

এই নবোদ্ভুত পরিবেশ ইমাম শাফেয়ীর প্রকৃতির অনুকূল হয় নাই। এতদ্ব্যতীত খলীফা হারুনুর রশীদের যুগে তদানীন্তন ইসলাম জগতের অন্যান্য নগর নগরীর ন্যায় বাগদাদেও আহলে সুন্নাতগণেরই সর্বাধিক প্রভাব ও প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু মামুনুর রশীদের গায়ের-ইসলামী দার্শনিক রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী বাগদাদে জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিল। আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণের পরিবর্তে বাগাদাদে তখন মু'তাযিলাদের প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাইতেছিল। মু'তাযিলারাই রাজদরবারের ভিতরে ও বাহিরে সর্বেসর্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন; বিদ্যা-বুদ্ধি এমন কি ফিকহ্

শাস্ত্রেও খলীফা মামুন তাঁহাদিগকেই অগ্রগণ্য বিবেচনা করিতেন। এই দিকে ইমাম শাফেয়ী-ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানিফার ন্যায় মু'তাযিলাদিগকে মোটেই বরদাশ্‌ত্ করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের প্রতিপাদন ভঙ্গী ও সমস্যার সমাধান রীতি তাঁহার মনঃপুত হইত না। ইতিমধ্যে মু'তাযিলাদের প্ররোচনায় মামুন কুরআন সৃষ্ট পদার্থ কিনা সে সম্পর্কে এক অভিমত অত্যন্ত কঠোরতার সহিত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তৎকালীন আহলে সুন্নত বিদ্বানগণকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে স্বয়ং মামুনুর রশীদ ইমাম শাফেয়ীকে বাগদাদের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু সমুদয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইমাম সাহেব খলীফার প্রস্তাব স্বসম্মানে প্রত্যাখান করিলেন এবং নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করিতে করিতে চিরদিনের মত এশিয়া মহাদেশ পরিত্যাগ করিয়া মিসরের যাত্রী হইলেন ঃ

لقد أصبحت نفسى تتوق
الى مصر !
ومن دونها أرض المهامة والقفر !
فو الله ما أدرى الفوز والغنى ؟
أساق إليها أم أساق إلى قبرى ؟

অর্থাৎ আমার মন মিসরের দিকে এখন বড়ই আগ্রহান্বিত হইয়াছে, কিন্তু এ পথ দুঃখপূর্ণ ও তৃর্ণলতাদি শূন্য! আল্লাহর শপথ! আমি জানি না, আমি সাফল্য ও সম্পদের সহিত মিলিত হইবার জন্য তথায় গমন করিতেছি, না কবরের মুখে প্রবেশ করার জন্য।

মিসরে পদার্পণ

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, ইমাম শাফেয়ী তদীয় কবিতায় দুইটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটির প্রত্যাশা করিলেও মিসরে তিনি উভয় বস্তুরই অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৯৮ হিজরীতে ইমাম শাফেয়ী মিসরে উপস্থিত হইবার সংগে সংগেই উক্ত প্রদেশের শাসনকর্তা রাজকোষ হইতে অভাবগ্রস্ত জ্ঞাতির অংশ ইমাম শাফেয়ীর জন্য বরাদ্দ করিয়া দিলেন। ফলে তিনি জীবিকার চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া নবোদ্যমে স্বীয় ফিকহী স্কুলের প্রতিষ্ঠা কল্পে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। আব্দুল্লাহ বিনে আবদুল হাকাম (মৃঃ ২১৪ হি) মুহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ বিনে আবদুল হাকাম (মৃঃ ২৭৮ হিঃ) রুবাইয়অ বিনে সুলায়মান, (মৃঃ

২৭০ হিঃ) ইসমাঈল বিনে ইয়াহয়া মুযানী (মৃঃ ২৬৪ হিঃ), ইউসুফ বিনে ইয়াহ্য়া বুওয়ায়তী (মৃঃ ২৩১ হিঃ) প্রভৃতি প্রথিতযশা বিদ্বানগণ কেহ মালিকী ও কেহ হানাফী স্কুল পরিত্যাগ করিয়া ইমাম সাহেব কর্তৃক স্থাপিত নূতন শাফেয়ী দলে দীক্ষিত হইলেন। মিসরেই ইমাম সাহেব তাঁহার মযহব অনুসারে বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থরাজি যথা কিতাবুল উম, ইমলায়ে কুবরা, ইমলায়ে সগীর, মুখতসর বওয়ায়তী, মুখতসর মুযানী, মুখতসর রুবাইয়অ ও কিতাবুসসুনন প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী বাগদাদে অবস্থানকালীন আপন গ্রন্থ সমূহে যে সকল সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেগুলি "মহযবে কদীম" আর মিসরে লিখিত গ্রন্থরাজিতে বর্ণিত অভিমত "মযহবে জদীদ" বলিয়া শাফেয়ী ফিক্‌হে উল্লিখিত হইয়াছে।

ইমাম শাফেয়ীর পরিগৃহীত ব্যবহারিক মযহব

১৯৫ হিজরী অর্থাৎ বাগদাদে প্রবেশ করার অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালিকের সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থক ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে, ইমাম মালিকের অন্ধ ভক্তের দল তাঁহার উক্তি ও সিদ্ধান্ত সমূহকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসেরও উর্ধ্বেস্থান দিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে প্রমাদহীন সাব্যস্ত করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন তখন ইমাম শাফেয়ী বাধ্য হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীস সমূহের রক্ষী এবং প্রহরীরূপে ইমাম মালিকের মযহবের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মযহবী ফির্কাবন্দীর প্রতিবাদ

ইমাম শাফেয়ী একাধারে ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আওযায়ীর সিদ্ধান্ত সমূহের কঠোর প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন। স্বীয় উসতায ইমাম মালিকের বিরোধ করিতে গিয়া তিনি এক বৎসর কাল ধরিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁহার গ্রন্থ "খিলাফু মালিক" ভুবন বিখ্যাত। ইমাম ফকরুদ্দীন রাযী লিখিয়াছেন, ইমাম শায়েফী অবগত হইলেন যে, স্পেনে ঃ ইমাম মালিকের একটি টুপী আছে, মালেকীরা সেই টুপির দোহাই দিয়া বৃষ্টির প্রার্থনা করিয়া থাকে। এবং সকল অন্ধভক্তদের যখন বলা হইত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ বলিয়াছেন। তাহারা সে কথার জওয়াবে তৎক্ষণাৎ বলিত, ইমাম মালিক এইরূপ বলিয়াছেন। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি অবলোকন করিয়া ইমাম শাফেয়ী

ইহা প্রতিপন্ন করিতে দৃঢ় সংকল্প হইলেন যে, ইমাম মালিক যত বড়ই বিদ্বান হউন না কেন তিনি নবী বা রাসূল ছিলেন না। এবং তাঁহাকে অভ্রান্ত ও প্রমাদবিহীন মনে করা মুর্খতার নিদর্শন মাত্র। তাই যে সকল সিদ্ধান্তে ইমাম মালেকের ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল, ইমাম শাফেয়ী অকাট্য প্রমাণ সহকারে সেগুলির স্বরূপ স্বীয় গ্রন্থে উদঘাটিত করিলেন। এই ভাবে তিনি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আওযায়ীর মযহবের ভ্রান্তিগুলিও ধরাইয়া দিয়াছিলেন।

ইমাম শাফেয়ীর বৈশিষ্ট্য

ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম আবু হানীফার (র) মযহবদ্বয়ের মূলনীতি এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা যখন পুস্তকাকারে সংকলিত হইতে আরম্ভ করে, সেই সময় ইমাম শাফেয়ী (র) আবির্ভূত হন। তিনি পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের কার্যকলাপ অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেগুলির মধ্যে এমন অনেক বিষয় লক্ষ্য করেন যে, অবশেষে তিনি ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আবু হানীফার (র) স্থাপিত স্কুল দুইটিকেই পরিহার করিতে বাধ্য হন। ইমাম সাহেব এই সকল কথার আলোচনা তাঁহার স্বনামধন্য "উম্" নামক গ্রন্থের সূচনায় করিয়াছেন।

১। তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার পূর্ববতী ইমামদ্বয় 'মুরসল' ও 'মুন্‌কাতা'*[১] উভয়বিধ হাদীস গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং এই কারণে তাঁহাদের উক্তির ভিতর ত্রুটি ও বৈষম্য ঘটিয়াছিল কারণ হাদীসের সনদ এবং মতনের সবগুলি পদ্ধতি একত্রিত করিয়া তিনি দেখিতে পান যে, অনেকগুলি মুরসল হাদীস ভিত্তিহীন। অধিকন্তু অনেকগুলি মুরসাল হাদীস মুসনদ হাদীসের পরিপন্থী। ফলে ইমাম শাফেয়ী মুরসল হাদীস গ্রহণ করার জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করেন। এই নিয়মগুলি উসুলে ফিক্‌হের গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত রহিয়াছে।

২। তিনি দেখিতে পান যে, বিচ্ছিন্নরূপী 'নস্' সমূহের মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার কোন নিয়ম হানাফী ও মালেকীদের কাছে নাই। এই জন্য তাঁহাদের ইমামদ্বয়ের ইজতিহাদী মসআলা সমূহে গোলযোগ ঘটিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, হাদীসের বিভিন্ন উক্তি এবং কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ সমূহের

---

[১]যে হাদীস কোন তাবেয়ী সাহাবার নাম উল্লেখ না করিয়াই রাসূলুল্লাহর (সা) প্রমুখাত রেওয়ায়াত করেন সেই হাদীসকে 'মুরসাল' বলা হয় আর যে হাদীসের ছনদের মধ্যে কোন রাবীর নাম বাদ পড়িয়া যায় তাহা মুনকাতা নামে অভিহিত হয়।

মধ্যে পার-স্পরিক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য প্রতিপাদন কল্পে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। পৃথিবীতে উসুলে ফিক্‌হের ইহাই সর্বপ্রথম গ্রন্থ।

(ক) ইমাম শাফেয়ীর উসুল বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত ঘটনাটি অনুধাবন করা কর্তব্য। ইমাম শাফেয়ী যখন বাগদাদে ইমাম মুহাম্মদের নিকট আগমন করেন, তখন তিনি শুনিতে পান যে, ইমাম মুহাম্মদ মদীনার বিদ্বানগণকে এই বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছেন যে, তাঁহারা একজনের সাক্ষ্য আর একটি শপথের সাহায্যে বিচার মীমাংসা করার অনুমতি দিয়া থাকেন। তিনি বলিতেছিলেন, মদীনার বিদ্বানগণের এই আচরণ কুরআনের অতিরিক্ত (যায়েদ আলাল কিতাব)

হানাফীগণ "খবরে ওয়াহিদ" অর্থাৎ একজন রাবীর বর্ণিত হাদীস দ্বারা কুরআনের নির্দেশের অতিরিক্ত কোন মীমাংসা গ্রাহ্য করেন না। কুরআনে বর্ণিত সাক্ষ্য আইনের বিধান এই যে, দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ আর দুইজন নারীর সাক্ষ্য ও একটি শপথ দ্বারাও বিচার মীমাংসা করার অনুমতি বিদ্যমান রহিয়াছে। হানাফীগণ এই হাদীস দ্বিবিধ কারণে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রথমতঃ উহা কুরআনের নির্দেশিত বিধানের অতিরিক্ত। দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসের মূল রাবী একজন মাত্র। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মুহাম্মদের বিদ্রূপের জওয়াবে বলিলেন যে, সত্যই কি আপনাদের কাছে "খবরে ওয়াহিদ" দ্বারা কুরআনের অতিরিক্ত কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়? ইমাম মুহাম্মদ বলিলেন, ইহাই আমাদের মযহব। ইমাম শাফেয়ী প্রশ্ন করিলেন যে, তাহা হইলে ওয়ারিসের জন্য ওসীয়ৎ নাই' রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস সূত্রে আপনারা ওয়ারিসের জন্য ওসীয়ৎকে অবৈধ বলিয়া থাকেন কেন,? অথচ কুরআনে উক্ত হইয়াছে যে, তোমাদের কাহারও সম্মুখে মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে সে যদি বিত্তশীল হয়, - তাহা হইলে তাহাকে পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায়সংগত ভাবে ওসীয়ৎ করিয়া যাইতে হইবে (আলবাকারা, ১৮০ আয়াত)।

এইভাবে ইমাম শাফেয়ী আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত উত্থাপিত করেন এবং ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত ইমাম মুহাম্মদ চুপ করিয়া যাইতে বাধ্য হন।

৩। ইমাম শাফেয়ী দেখিতে পান, যে সকল তাবেয়ী ফতওয়া প্রদান করার অধিকার পাইয়াছিলেন, অনেকগুলি বিশুদ্ধ হাদীস তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল। আর এই জন্য তাঁহারা ইজতিহাদের আশ্রয় গ্রহণ এবং সাধারণ নিয়মের অনুসরণ অথবা পরবর্তী সাহাবাগণের অনুসরণ করিয়া তদনুসারে ফতওয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর তৃতীয় স্তরের বিদ্বানগণ সেই সকল হাদীস অবগত হইবার সুযোগ লাভ করা সত্ত্বেও তাঁহারা সেগুলি প্রত্যাখান করেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, এই

হাদীসগুলি আমাদের নগরের বিদ্বানগণের পরিগৃহীত আচরণ এবং রীতির পরিপন্থী। ফলে নাগরিক বিদ্বানগণের রীতি এবং আচরণের দরুণ রাসূলুল্লাহর (স) বহু হাদীস দুষণীয় বিবেচিত হইতে থাকে। তৃতীয় স্তরের বিদ্বানগণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আহলে হাদীস বিদ্বানগণ হাদীস সমূহের বিভিন্ন সনদ ও মতন্‌গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং দেশ দেশান্তর পর্যটন করিয়া বিদ্বাজ্জনমণ্ডলীর সাক্ষাৎকার অর্জন করিলেন তখন আরও বহু হাদীস এরূপ প্রকাশ লাভ করিল যেগুলি সাহাবীগণের মধ্যে মাত্র দুই একজন এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের মধ্যে মাত্র দুই একজন এবং তদীয় শিষ্যগণের মধ্যেও দুই একজন রেওয়ায়ত করিয়াছিলেন, এই সকল হাদীস ফিকাহ শাস্ত্রের বিদ্বানগণের নিকট অপ্রকাশিত ছিল, কিন্তু হাদীস শাস্ত্রবিশারদ ইমামগণের যুগে প্রকাশ লাভ করে। আবার এমনও অনেকগুলি হাদীস দেখিতে পাওয়া যায়, যেগুলি শুধু বসরা শহরের বিদ্বানরাই রেওয়ায়ত করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য নগরের বিদ্বানগণ সেগুলির দিকে দৃকপাত করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, সাহাবা এবং তাবেয়ী বিদ্বানগণের চিরাচরিত আচরণ ছিল এই যে, কোন মাসআলার সমাধান হাদীসে প্রাপ্ত না হইলে তাহারা অন্যবিধ প্রামাণিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন কিন্তু উত্তরকালে সেই সকল সমস্যার সমাধান যদি কোন হাদীসের মধ্যে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্বীয় ইজতিহাদ পরিহার করিয়া তাঁহারা আল্লাহর রাসূলের (সা) হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেন। তাঁহাদের উল্লিখিত আচরণ দ্বারা সংশয়াতীত ভাবে ইহা প্রমাণিত হইল যে, কোন সাহাবা যদি কোন হাদীস অনুসরণ না করিয়া থাকেন, তাহাতে উক্ত হাদীসের:কোন ত্রুটি বা দোষ সাব্যস্ত হইবে না। অবশ্য ত্রুটি বা দোষের কারণ যদি তাঁহারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়া থাকেন তবেই সেই হাদীস বর্জনীয় হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ "কুল্লাতায়নের" হাদীস পেশ করা যাইতে পারে। ইমাম সাহেব বলেন, এই হাদীস অভ্রান্ত এবং বিভিন্ন সনদে বর্ণিত। কিন্তু ইহার সমুদয় সনদের গোড়া এই যে, এই হাদীসটি ওলীদ বিনে কসীর মুহাম্মদ বিনে জা'ফর বিনে যুবায়র অথবা মুহাম্মদ বিনে ইবাদ বিনে জা'ফরের প্রমুখাত এবং তাঁহারা দুইজন উবায়দুল্লাহ বিনে আবদুল্লাহর এবং তিনি ইবনে উমরের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী যুগে এই হাদীস বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় রেওয়ায়ত করা হইলেও মূল রাবী দুইজন অর্থাৎ মুহাম্মদ বিনে জা'ফর এবং মুহাম্মদ বিনে ইবাদ যেহেতু ফাতওয়া দানের অধিকার তাঁহাদের জীবদ্দশায় লাভ করেন নাই, তাই তাঁহারা দুইজন বিশ্বস্ত বিদ্বান হওয়া স্বত্বেও তাঁহাদের এই হাদীস সইদ বিনুল মুসাইয়েব এবং যুহরীর সময়ে প্রকাশ লাভ করে নাই আর এই জন্য

মালিকী ও হানাফীগণ এই হাদীস অনুসরণ করেন নাই। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

"কুল্লাতায়ন," কুল্লার দ্বিবচন। কুল্লাহ্ এমন বৃহৎ মটকাকে বলে যাহাতে পাক্কি ওজনের সোয়া ছয় মণ পানি সঙ্কুলিত হয়। কেহ কেহ বলেন, এক কুল্লা আড়াই মশক পানির সমান। হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পানির পরিমাণ দুই কুল্লা হইলে তাহাকে অপবিত্রতা স্পর্শ করিবে না।

এরূপ ধরনের আর একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে 'খিয়ারে-মজলিসের' হাদীস। এই হাদীসের তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আদেশ করিয়াছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি উভয়েরই বাতিল করার অধিকার রহিবে। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার তাৎপর্য হানাফী বিদ্বানগণ "উক্তির বিচ্ছিন্নতা" রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাফেয়ীগণ ইহার অর্থ 'দৈহিক বিচ্ছিন্নতা' ধরিয়াছেন।

হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ এবং বহুবিধ সনদ সহকারে বর্ণিত। সাহাবীগণের মধ্যে ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা ইহার অনুসরণও করিয়াছিলেন কিন্তু তাবেয়ীগণের ফকীহ সপ্তক এবং তাঁহাদের সমসাময়িক বিদ্বানগণ এই হাদীসের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই। আর এই কারণেই ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফা তাবেয়ীদের যুগে এই হাদীস প্রকাশ লাভ না করাকে হাদীসের ত্রুটির কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং ইহা বর্জন করিয়াছিলেন কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এই হাদীস গ্রহণ করেন।

৪। সাহাবীগণের যে সকল উক্তি এযাবৎ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়ান ছিল, ইমাম শাফেয়ীর যুগে সেগুলি প্রচুর পরিমাণে সংকলিত হয়। তিনি দেখিতে পান যে, অনেক ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস না পাওয়ার দরুণ সাহাবীগণের উক্তি হাদীসের প্রতিকূল হইয়াছে। ইমাম শাফেয়ী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, এরূপ ধরণের ব্যাপারে সুবর্ণ যুগের বিদ্বানগণ সর্বদা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত পরিহার করিয়া তাহার পরিবর্তে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বরণ করিয়া লইতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইমাম শাফেয়ীও এই কারণে সাহাবীগণের মিলিত সিদ্ধান্ত ব্যতীত তাঁহাদের ব্যক্তিগত উক্তিকে দলীলরূপে গ্রহণ করার রীতি পরিত্যাগ করেন এবং বলেন যে, সাহাবীগণও মানুষ ছিলেন আর আমরাও মানুষ! একথার তাৎপর্য এই যে, সাহাবীগণ যেরূপ কুরআন ও হাদীস হইতে সরাসরিভাবে মসআলা সমূহ প্রতিপাদন করার অধিকারী ছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ অধিকার রহিয়াছে।

৫। ইমাম শাফেয়ী এরূপ একদল ফকীহ দেখিতে পান যে, তাঁহারা ব্যক্তিগত মতকে-যাহা শরীঅত কর্তৃক অনুমোদিত নয়, শরীয়তের অনুমোদিত কিয়াসের সহিত সেগুলি মিশাইয়া ফেলিয়াছেন এবং এরূপ 'রায়' ও 'কিয়াসের' মধ্যে তাঁহারা পার্থক্য অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না। তাহারা তাঁহাদের এরূপ ধরণের "রায়কে" ইসতিহসান নামে অভিহিত করিতেছেন। কোন ক্ষতি বা লাভকে আদেশের কারণ নির্ণয় করার তাৎপর্য হইতেছে 'রায়'। কিন্তু কিয়াসের আদেশের কারণ কুরআন ও হাদীস হইতেই নির্ণয় করা হইয়া থাকে এবং সেই কারণকে ভিত্তি করিয়াই আদেশ প্রদান করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইয়াতীম (পিতৃহীন) বুদ্ধিমান হইলেই তাহার সম্পত্তি তাহার হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই শরীয়তের ব্যবস্থা। এক্ষণে ইসতিহসান অনুসারে পঁচিশ বৎসর বয়স হইলেই ইয়াতীমকে বুদ্ধিমান গণ্য করিতে হয়। আর কিয়াস এই যে, যখনই ইয়াতীমের ভিতর বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে তখনই তাহাকে তাহার সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে হইবে। বয়সের তারতম্য শরয়ী কিয়াসের ভিতর স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

ফলকথা, ইমাম শাফেয়ী এই ইসতিহসানের কঠোর প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, যাহারা ইসতিহসান করিতে চায় তাহারা পয়গম্বরের আসন অধিকার করার বাসনা পোষণ করিয়া থাকে। ইমাম শাফেয়ীর এই উক্তি কাযী উযদ তাঁহার 'মুখতসর' নামক উসূল গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। মোটের উপর পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের উপরিউক্ত রীতি এবং কার্যকলাপ দর্শন করিয়া ইমাম শাফেয়ী নূতন ভাবে ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়নের কার্যে ব্রতী হন এবং উহার উসূল রচনা করেন আর সেই উসূলকে ভিত্তি করিয়া ব্যবহারিক সমস্যা সমূহের বিস্তৃত সমাধান কল্পে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। [হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা, ১৫১ ও ১৫২ পৃঃ।]

ইমাম শাফেয়ীর বিতর্ক ও বিচার

আজকালকার পরিভাষায় যাহাকে ডিবেট বলা হয়, পূর্ববর্তী যুগের বিদ্বানগণ তাহাকেই 'মুনাযরা' বলিয়া আখ্যাত করিতেন। জ্ঞানের সম্প্রসারণ এবং ভ্রান্তি ও অভ্রান্তির নিরুপণকল্পে এই মুনাযরা বা ডিবেটের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইমাম শাফেয়ী বিদ্বানগণের সহিত এইরূপ বিতর্ক ও বিচারে সর্বদাই প্রবৃত্ত থাকিতেন এবং স্বীয় অগাধ বিদ্যাবত্তা, প্রখর ধীশক্তি এবং সাহিত্যিক প্রতিভার বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষকে পরাস্ত অথবা নিরস্ত হইতে বাধ্য করিতেন।

আমরা নিম্নে ইমাম সাহেবের এইরূপ কয়েকটি মুনাযরার বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করিব।

ক) একদা ইমাম শাফেয়ী তদীয় উস্তায় ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসানের সহিত কূপের পানির মসআলা লইয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। ফকরুদ্দীন রাযী তাঁহার মনাকাবশ শাফেয়ী গ্রন্থে এই বিতর্কের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ইমাম রাযীর প্রদত্ত বিবরণের সারাংশ এই যে, ইমাম শাফেয়ী ইমাম মুহাম্মদকে বলিয়াছিলেন যে, কোন কূপে ইঁদুর মরিলে আপনারা বলিয়া থাকেন, যে, কূপ হইতে কুড়ি বালতি পানি তুলিয়া ফেলিয়া দিলে উক্ত কূপ পবিত্র হইবে। কোন বস্তুর সমস্তটাই যদি অপবিত্র হয় তাহা হইলে উহার কতকাংশ ফেলিয়া দিলেই যে অবশিষ্টাংশ বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে, একথা যুক্তিযুক্ত কিয়াসের প্রতিকূল। ইহার উত্তরে যদি আপনারা বলেন যে, আমরা কিয়াসের প্রতিকূল হাদীসকে অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা হইলে আমি বলিব যে, আপনার এই উক্তি আরও আশ্চর্যজনক। কারণ যে হাদীসটিকে হাদীস তত্ত্ববিশারদগণ সমবেত ভাবে যঈফ বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, আপনারা উহাকে অবলম্বন করিয়া নিশ্চিত কিয়াসকে বর্জন করিলেন, অথচ গৃহপালিত পশুর স্তন্য সম্পর্কিত মসআলায় আপনারা সর্বসম্মত বিশুদ্ধ হাদীস অগ্রাহ্য করিয়া একটি দুর্বল কিয়াসের আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাপেক্ষা আরও চমৎকার ব্যাপার এই যে, কোন ব্যক্তি ওযুর উদ্দেশ্যে কূপের ভিতর হস্তকে প্রবিষ্ট করিলে আপনারা বলিয়া থাকেন যে, উক্ত কূপের সমস্ত পানি অপবিত্র হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেক বিন্দু পানি নিষ্কাশিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কূপ কিছুতেই পবিত্র হইবে না। পক্ষান্তরে উহাতে মরা অথবা নাপাক বস্তু পতিত হইলে বিশ, ত্রিশ বালতি পানি টানিয়া ফেলিয়া দিলেই উক্ত কূপ আপনাদের কাছে পবিত্র হইয়া যায়। আস্ত মরা আর প্রত্যক্ষ অপবিত্র বস্তু অপেক্ষা মানুষের হাত কেমন করিয়া অধিকতর নাপাক হইতে পারে আমরা একথা বুঝিতে অক্ষম।

(খ) ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসান বলিতেন যে, কুরআনে বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্তভাবে যে সকল দোয়ার উল্লেখ রহিয়াছে সেগুলি ছাড়া অন্য কোন দোআ নামাযের ভিতর পাঠ করা জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ী একদা তাঁহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, আপনার এরূপ উক্তির তাৎপর্য কি? আমরা দেখিতে পাই যে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ববিধ কল্যাণ কামনা এবং জাগতিক ও পারত্রিক অকল্যাণ হইতে রক্ষা-প্রাপ্তির যাচঞা স্বয়ং কুরআনেই উল্লেখিত হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আ) তদীয় বংশধরগণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন হে আল্লাহ,

وَارْزُقْهُمْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

"আমার বংশধরদিগকে সর্ব প্রকার খাদ্য ও মেওয়া দান করিও।" হযরত মূসা (আ) ফিরআউন ও তাহার দল বলের জন্য বদদোআ করিয়াছিলেন এইভাবেঃ

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ

হযরত যাকারিয়া (আ) এইভাবে পুত্র কামনা করিয়াছিলেন।

هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

হযরত সুলায়মান (আ) বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইতে চাহিয়াছিলেন এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া ঃ

هَبْ لِي مُلْكًا

হযরত নূহ (আ) ধন-সম্পদ-পুত্র এবং স্রোতস্বিনী প্রভৃতির প্রতিশ্রুতি স্বীয় জাতিকে প্রদান করিয়াছিলেন এইভাবে ঃ

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا -

অতএব যদিকোন ব্যক্তি নামাযের ভিতর এই বলিয়া প্রার্থনা করে যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সওয়ারীর জন্য অশ্ব, খাদ্যের জন্য মেওয়া, সাহচর্যের জন্য বিশুদ্ধ নারী দান কর, তাহা হইলে এ সমুদয় বস্তুর কথাই কুরআনে উল্লিখিত রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কুরআনে উল্লিখিত দু'আ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জন্য নামাযের ভিতর প্রার্থনা করা অবৈধ, আপনার এরূপ উক্তির কোন অর্থই থাকিতে পারে না।

ফকরুদ্দীন রাযী লিখিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ হাদীসে প্রমাণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের ভিতর বিভিন্ন গোত্রের প্রতি বদদোআ করিয়াছিলেন, এমন কি তাহাদের নাম ও গোত্রের উল্লেখও বদ দু'আর ভিতর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইমাম শাফেয়ীর মযহব অনুসারে নামাযের ভিতর আল্লাহর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা অবৈধ হইবে না। শুধু পরস্পরের মধ্যে কথা বার্তা এবং পরস্পরের নিকট যাচঞা ও প্রার্থনাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমি বলিতে চাই যে, স্বয়ং- রাসূলুল্লাহ (সা) আদেশ করিয়াছেন, তোমরা সিজদার

মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিতে সচেষ্ট হইও, কারণ সিজদাকালীন দু'আ গ্রাহ্য হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও রুকুর পর এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ করিয়াছেন এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের পর সাহাবীগণকে নামাযের ভিতর দু'আ করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

(গ) একদা ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসানের সহিত ইমাম শাফেয়ীর নিম্নরূপ কথোপকথন হইল ঃ

মুহাম্মদ বিনুল হাসান ঃ আমি জানিতে পারিয়াছি আপনি নাকি যবর দখলের (গছব) মসআলায় আমাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন?

শাফেয়ী ঃ এ কথা সত্য।

মুহাম্মদ ঃ এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত বিতর্ক ও বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাই।

শাফেয়ী ঃ আমার কোন আপত্তি নাই।

মুহাম্মদ ঃ আচ্ছা বলুন দেখি, কোন ব্যক্তি কাহারও কড়িকাঠ যবরদস্তী দখল করিয়া নিজের ঘরের ছাদে সংযুক্ত করিল এবং এই নির্মাণ কার্যে তাহার সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইল। ইতিমধ্যে কড়িকাঠের অধিকারী আসিয়া সাক্ষ্য দ্বারা নিজের অধিকার প্রমাণিত করিল। এরূপ অবস্থায় আপনার অভিমত কি?

শাফেয়ী ঃ কড়িকাঠের মালিক যদি মূল্য লইয়া নিরস্ত হয় তাহা হইলে ভাল, অন্যথায় তাহার কড়িকাঠ যবর দখলকারীর ছাদ হইতে উপড়াইয়া লইয়া মালিককে সমর্পণ করা হইবে।

মুহাম্মদ ঃ আচ্ছা আর একটি কথা। জনৈক ব্যক্তি একখণ্ড কাষ্ঠ ফলক যবর দখল করিয়া স্বীয় নৌকায় সংযোজিত করিল, নৌকাখানা নদীর মধ্যভাগে পৌঁছিলে তক্তার মালিক আসিয়া পড়িল আর সাক্ষ্য প্রমাণদ্বারা নিজের অধিকার প্রমাণিত করিল। তখন কি আপনি সেই মাঝ দরিয়ায় তক্তাখানা উৎপাটিত করিয়া মালিককে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা দিবেন?

শাফেয়ী ঃ না।

শাফেয়ীর এই জওয়াবে ইমাম মুহাম্মদ এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে তকবীর ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং

বলিলেন, শাফেয়ীর পরাজয় হইয়াছে। তিনি তাঁহার পূর্ব সিদ্ধান্ত স্থির থাকিতে পারেন নাই।

পুনশ্চ ইমাম মুহাম্মদ বলিলেন, আচ্ছা আর এক কথা, জনৈক ব্যক্তি রেশমের কিছুটা সূতা যবরদস্তী দখল করিয়া লইল। ইতিমধ্যে তাহার পেট ফাটিয়া যাওয়ায় উক্ত সূতার সাহায্যে তাহার পেট সিলাই করিয়া দেওয়া হইল। এ সম্পর্কে আপনার ব্যবস্থা কি?

শাফেয়ী ঃ কিছুতেই উহার পেট বিদীর্ণ করা চলিবে না।

শাফেয়ীর উত্তর শুনিয়া মুহাম্মদ বিনুল হাসান এবং তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ পুনশ্চ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তকবীর ধ্বনি করিলেন এবং বলিলেন, আপনার প্রথম উক্তির ভ্রান্তি আপনারই মুখে প্রতিপন্ন হইল।

শাফেয়ী ঃ থামুন, থামুন অত ব্যস্ত হইবেন না। আমারও কিছু আপনার নিকট জিজ্ঞাসা রহিয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিবেন কি যে, উক্ত ব্যক্তি যে, সূতায় নিজের পেট সিলাই করিয়াছিল যদি সেই সূতা তাহার নিজস্ব হইত তাহা হইলে তাহার পেট বিদীর্ণ করিয়া সেই সূতা পৃথক করা হালাল হইত না হারাম?

মুহাম্মদ ঃ হারাম!

শাফেয়ী ঃ আর তক্তাখানা যাহা সে নৌকায় সংযুক্ত করিয়াছিল, সেটা যদি তাহার নিজের হইত, তাহা হইলে মাঝ দরিয়ায় উহা উৎপাটিত করা হালাল হইত, না হারাম?

মুহাম্মদ ঃ হারাম!

শাফেয়ী ঃ এখন বলুন দেখি, বাড়ীর মালিক যদি নিজের বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায় তাহা হইলে তাহার এই কার্য দুরস্ত হবে, না হারাম?

মুহাম্মদ ঃ অবশ্যই দুরস্ত হইবে।

শাফেয়ী ঃ আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! আপনি দুরস্ত কার্যকে হারাম কার্যের সহিত তুলনা করিতেছেন কেমন করিয়া?

মুহাম্মদ ঃ আচ্ছা বুঝিলাম। কিন্তু নৌকা সম্বন্ধে আপনি কি করিতে বলেন?

শাফেয়ী ঃ প্রথমতঃ নৌকাটিকে মাঝ দরিয়া হইতে উপকূলে আনিতে হইবে। অতঃপর যবর দখলের- তক্তাখানি নৌকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার মালিকের হস্তে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

মুহাম্মদ ঃ কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা চলিবে না।

لاضرر ولا ضرار

শাফেয়ী ঃ ক্ষতিগ্রস্ত তাহাকে কেহই করে নাই, সে নিজের ক্ষতি নিজেই করিয়াছে।

শাফেয়ী ঃ এইবারে আমিও আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। আচ্ছা বলুন দেখি, বহু গুণসম্পন্ন জনৈক ব্যক্তি যদি কোন দুষ্ট নিগ্রোর দাসীকে যবর দখল করিয়া লইয়া যায় এবং তাহার সহিত গৃহবাস করার ফলে উক্ত দাসীর গর্ভে দশজন চারুদর্শন এবং গুণবান সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আর বহু যুগ পর উক্ত নিগ্রো নিজেকে উক্ত দাসীর অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার গর্ভস্থ সন্তানগুলি সম্বন্ধে আপনি কি মীমাংসা করিবেন?

মুহাম্মদ ঃ ঐ দুষ্ট নিগ্রোটাই ছেলেগুলির মালিক হইবে।

শাফেয়ী ঃ আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, উক্ত সম্ভ্রান্ত, সুদর্শন এবং গুণবান ছেলেগুলিকে দাসে পরিণত করাই বেশী ক্ষতির কারণ হইবে, না নৌকার তক্তাখানা উপড়াইয়া ফেলায় অধিকতর ক্ষতি সাধিত হইবে?

ইমাম শাফেয়ীর কথায় ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসান মৌনাবলম্বন করিলেন।

আর একদিন মুহাম্মদ বিনুল হাসান ও শাফেয়ীর মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হইল।

(ঘ) **মুহাম্মদ** ঃ আচ্ছা বলুন দেখি আমাদের- উস্তায (ইমাম আবু হানীফা) অধিকতর বিদ্যান ছিলেন, না আপনার উস্তায (ইমাম মালিক)?

শাফেয়ী ঃ আপনি এ বিষয়ে ন্যায়পরায়ণতার সহিত-বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন কি?

মুহাম্মদ ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই।

শাফেয়ী ঃ তাহা হইলে আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আমার উসতায কুরআনের বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী ছিলেন, না আপনার উসতায ?

মুহাম্মদ ঃ আল্লাহর কসম। কুরআনের বিদ্যায় আপনার উসতাযই অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।

শাফেয়ী ঃ ভালকথা। আর আল্লাহর রাসূলের (সা) হাদীস শাস্ত্রে আমার উসতায অধিকতর সুদক্ষ ছিলেন, না আপনার উসতায ?

মুহাম্মদ ঃ আল্লাহর শপথ ! আপনার উসতাযই রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসে অধিকতর দক্ষতা রাখিতেন।

শাফেয়ী ঃ আর সাহাবীদের সিদ্ধান্তসমূহে কে অধিকতর বিদিত ছিলেন?

মুহাম্মদ ঃ আল্লাহর শপথ ! সাহাবীদের উক্তি সম্পর্কেও আপনার উসতায অধিকতর বিদিত ছিলেন।

শাফেয়ী ঃ তাহা হইলে কিয়াস ছাড়া আর কি অবশিষ্ট রহিল? আর কিয়াসের ভিত্তিও তো কুরআন, হাদীস এবং সাহাবীদের সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

মুহাম্মদ বিনুল হাসান শাফেয়ীর কথা শুনিয়া চুপ করিয়া গেলেন। [ইবনে খল্লাকান, (১) ৪৩৯ পৃষ্ঠা]

আরও কয়েকটি বিতর্ক ও বিচার

(ঙ) ইমাম শাফেয়ী একদা ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলকে বলিলেন, কোন ব্যক্তি যদি একটি নামাযও পরিত্যাগ করে, আপনারা নাকি তাহাকে কাফের বলিয়া থাকেন।

ইমাম আহমদ ঃ জী হাঁ।

শাফেয়ী ঃ আচ্ছা সেই কাফের যদি পুনরায়-মুসলমান হইতে চায় তাহা হইলে তাহাকে কি করিতে হইবে ?

আহমদ ঃ তাহাকে নামায পড়িতে হইবে।

শাফেয়ী ঃ তাহা হইলে আপনাদের কাছে কাফেরের নামাযও গ্রাহ্য? নামায সঠিক হওয়ার জন্য আপনারা কি ইসলামের শর্ত স্বীকার করেন না?

ইমাম শাফেয়ীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার যশস্বী ও বরেণ্য ছাত্র ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

(চ) হানাফী মযহবের কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তি সমবেত হইয়া একদা ইমাম শাফেয়ীর সহিত পিতৃহীনের ধনে যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। ইমাম শাফেয়ীর সিদ্ধান্ত এই যে, অপরিণত বয়স্ক পিতৃহীন বালক বালিকার

ধনেও- যাকাতের আদেশ বর্তাইবে। উভয় পক্ষের মধ্যে যে সকল কথার আলোচনা হইয়াছিল, তাহার সারাংশ নিম্নে সংকলিত হইল।

হানাফী বিদ্বানগণ ঃ আল্লাহ বলিয়াছেন,

أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

"নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও।" এই আয়াতে নামায এবং যাকাত তুল্য পর্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং অপরিণত বয়স্ক পিতৃহীন বালক বালিকার জন্য যেরূপ নামায ফরয নয়, সেইরূপ তাহাদের ধনে যাকাতও ফরয হইতে পারে না। অধিকন্তু মদ্য পান ও ব্যভিচারের অপরাধের জন্যও ইসলামী দণ্ডবিধির বিধান তাহাদের উপর প্রযোজ্য নয়। এমন কি কুফরের মধ্যে লিপ্ত হইলেও মূর্তাদের দণ্ড তাহার উপর প্রযুক্ত হয় না। আরও রাসূলুল্লাহ (সা) আদেশ করিয়াছেন যে, তিন প্রকার মানুষ (শরীঅতের নির্দেশের) আওতার বাহিরে, যথা ঃ শিশু, পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তি।

শাফেয়ী ঃ আপনারা যে অভিযোগ আমার উপর আরোপ করিতেছেন আপনারা স্বয়ং সেই অভিযোগে অভিযুক্ত। কারণ আপনারা অপরিণত বয়স্ক পিতৃহীনের জমির উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদের ধনে সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব বলিয়া থাকেন সুতরাং কেমন করিয়া আপনারা শরীঅতের কতক নির্দেশ ইয়াতীমের উপর বলবৎ রাখিয়া আবার কতক নির্দেশ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত রাখিতে পারেন? অধিকন্তু আল্লাহ তা'লা মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত স্ত্রীর জন্য চারি মাস দশ দিনের ইদ্দত নির্ধারিত করিয়াছেন, আর আপনারা বালিকা এমন কি দুগ্ধ পোষ্য শিশুকেও এই আদেশের অনুসরণ ব্যাপারে বয়ঃপ্রাপ্তা নারীর মত ধরিয়া লইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দৈহিক এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যাপারেও আপনাদের কাছে বালকরা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষেরই পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হইয়া থাকে। এইভাবে আপনারা অপরিণত বয়স্ক শিশুদিগকে শরীঅতের কতক অনুশাসনের বাধা এবং কতক শাসন হইতে মুক্ত বিবেচনা করেন কেমন করিয়া? নামায ও যাকাতকে একই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়া আপনারা শিশুর প্রতি নামাযের মত যাকাতের আদেশও প্রযোজ্য হইবে না বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আপনাদের সেই সিদ্ধান্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। যে ব্যক্তি নিঃস্ব তাহার উপর যাকাতের আদেশ প্রযোজ্য হয় না বলিয়া নামাযের আদেশও কি প্রয়োজ হইবে না? একজন ধনী ব্যক্তি প্রবাসে তাহার নামায সংক্ষেপ (কসর) করার অধিকারী হয় বলিয়া তাহার যাকাতের পরিমাণও কি কমিয়া যাইবে? বৎসরকাল ধরিয়া কোন ব্যক্তি উন্মাদ বা বেহুঁশ হইয়া থাকিলে তাহার জন্য নামাযের আদেশ বলবৎ থাকে না বলিয়া যাকাতের আদেশও কি রহিত হইয়া যাইবে? মকাতিব দাসদাসী অর্থাৎ যাহারা নির্দিষ্ট

পরিমাণ অর্থ প্রদান করার বিনিময়ে মুক্তির প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের ধনে যাকাত ওয়াজিব নাই বলিয়া তাহাদের জন্য নামাযের হুকুমও কি রহিত হইয়াছে?

প্রতিপক্ষ দল ঃ আপনার বিচার পদ্ধতির চমৎকারিত্বে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঈদ বিনে জুবায়র এবং ইব্‌রাহীম নখয়ী প্রমুখ প্রথিতযশা তাবেয়ী বিদ্বানগণও পিতৃহীন শিশুর ধনে যাকাত ওয়াজিব নাই বলিয়াই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

শাফেয়ী ঃ তাবেয়ী বিদ্বানগণ সম্বন্ধে হযরত ইমাম আবু হানীফা কি একথা বলিয়া যান নাই যে, তাঁহারাও মানুষ ছিলেন আর আমরাও মানুষ? আমরা শুধু আমাদের বিচার বুদ্ধি লইয়াই তাঁহাদের মতের অন্যথাচরণ করিতে পারি। অথচ রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের অনুসরণে কতিপয় তাবেয়ী বিদ্বানের অভিমত মান্য করার জন্য আপনারা আমার দোষ ধরিতেছেন কেমন করিয়া?

প্রতিপক্ষ দল ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিনে মসউদের মত মহাবিদ্বান সাহাবীও তো এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

শাফেয়ী ঃ ইবনে মসউদের অনুসরণ অপেক্ষা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের অনুসরণ করাই উত্তম। এতদ্ব্যতীত ইবনে মসউদের প্রমুখাৎ শুধু এইটুকুই বর্ণিত হইয়াছে যে, পিতৃহীন শিশুর অভিভাবক তাহার ধন হইতে যাকাত প্রদান করিবে না। একথার তাৎপর্য এই যে, শিশু স্বয়ং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার ধনের যাকাত পরিশোধ করিবে। পক্ষান্তরে ইবনে মসউদের রেওয়ায়ত প্রমাণিত নয়। ইহার জনৈক বর্ণনাদাতা অবিশ্বস্ত ব্যক্তি। সর্বশেষ কথা এই যে, আপনাদের মযহব অনুসারে কোন সাহাবীর উক্তি কেবল সেই ক্ষেত্রেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে যে স্থলে অন্য কোন সাহাবীর বিরোধ বিদ্যমান রহিবে না, আর বিভিন্ন সাহাবার ভিতর মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইলে অনির্দিষ্ট ভাবে যে কোন সাহাবীর মীমাংসা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে। অপরিণত বয়স্ক শিশুর ধনে যাকাত ওয়াজিব হইবার পক্ষে হযরত আলী, হযরত উমর, আবদুল্লাহ বিনে উমর, জননী আয়েশা প্রভৃতির সিদ্ধান্ত এমন কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসও মওজুদ রহিয়াছে।

বিতর্ক ও বিচারের জন্য বিদ্যাবত্তা ব্যতীত যে গভীর ধীশক্তি ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন ইমাম শাফেয়ী শৈশবকাল হইতেই অধিকারী ছিলেন। ইমাম ইবনে জরীর তাবারী লিখিয়াছেন, একদা ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালিকের দর্সের ক্লাশে উপস্থিত ছিলেন। তখনও ইমামের বয়স চতুর্দশ বৎসর অতিক্রম করে নাই। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি ইমাম মালিকের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল, ওগো আবদুল্লাহর পিতা, আমি বড়ই বিপন্ন হইয়াছি। আমি তোতা পাখী ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা করি। আজ আমি জনৈক ব্যক্তির নিকট তোতা বিক্রয় করিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পর ক্রেতা আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তোমার

তোতা কথা বলে না। এই বিষয়ে তাহার সহিত আমার বচশা হইল। আমি জোর গলায় তাহাকে বলিলাম, আমার তোতা কখনও নির্বাক থাকে না। যদি নির্বাক হয় তাহা হইলে আমার স্ত্রীর উপর তালাক। এখন জনাব, আপনি বলুন আমার কি উপায় হইবে? ইমাম মালিক সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উত্তর দিলেন যে, তোমার স্ত্রীর উপর তালাক সংঘটিত হইয়াছে।

লোকটি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করিতে করিতে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া গেল, আর বালক শাফেয়ীও চুপি চুপি ক্লাস হইতে বাহির হইয়া উহার অনুসরণ করিলেন। কিছুদূরে গিয়া বালক শাফেয়ী তোতা ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার তোতাটি অধিকাংশ সময় সবাক থাকে, না নির্বাক? সে বলিল, বেশীর ভাগ সময় আমার তোতা কথা বলিয়া থাকে কিন্তু কখনও কখনও চুপও হইয়া যায়। বালক শাফেয়ী বলিলেন, যাও তোমার স্ত্রীর উপর তালাক সংঘটিত হয় নাই! এই কথা বলিয়া শাফেয়ী ক্লাসে ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিলেন। ওদিকে জিজ্ঞাসাকারীও সঙ্গে সঙ্গে ইমাম মালিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, হযরত! আমার বিষয়টা আরেকবার দয়া করিয়া বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখুন। ইমাম সাহেব পুনশ্চ কিছুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করার পর বলিলেন যে, আমি যাহা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি তোমার জিজ্ঞাসার তাহাই সঠিক জওয়াব। লোকটি বলিল, আপনারই ছাত্রমন্ডলীর একজন আমাকে ফত্ওয়া দিয়াছেন যে, তালাক সংঘটিত হয় নাই।

ইমাম মালিক ঃ সে ছাত্রটি কে?

জিজ্ঞাসাকারী শাফেয়ীর দিকে ইংগিত করিয়া বলিল, ঐ বালক ছাত্রটি এইরূপ ফত্ওয়া দিয়াছেন।

ইমাম মালিক অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া শাফেয়ীকে বলিলেন, তুমি এই অবৈধ ফত্ওয়া কেমন করিয়া প্রদান করিলে?

শাফেয়ী ঃ আমি উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমার তোতাটি বেশীর ভাগ সময় চুপ থাকে, না কথা বলে? সে বলিয়াছিল, তাহার তোতাটি অধিকাংশ সময় সবাক থাকে। এই জন্যই আমি উক্ত ফত্ওয়া প্রদান করিয়াছি।

শাফেয়ীর কথা শুনিয়া ইমাম মালিক অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সরোষে শাফেয়ীকে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সবাক বা নির্বাক থাকার সময়ের স্বল্পতা এবং আধিক্যের সহিত এই তালাকের কি সম্পর্ক?

শাফেয়ী ঃ আপনি স্বয়ং উবায়দুল্লাহ বিনে যিয়াদের প্রমুখাতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এই হাদীস আমাকে শুনাইয়াছেন যে, ফাতিমা বিনতে কয়েস রাসূলুল্লাহর (সা) সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আবু জাহাম এবং মুআবিয়া উভয়েই আমাকে বিবাহের পয়গাম দিয়াছেন। আমি তাঁহাদের দুই জনার মধ্যে কাহার সহিত বিবাহিত হইব? হুযুর (সা) বলিলেন, "মুআবিয়া দরিদ্র ব্যক্তি আর আবু জাহাম কোন সময়ই তাঁহার কাঁধ হইতে লাঠি নামায় না।" শাফেয়ী বলিলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চয়ই ইহা অবগত ছিলেন যে, আবু জাহাম পানাহার করিয়া থাকেন এবং নিদ্রাও যান। এই হাদীসটির সাহায্যে আমি বুঝিলাম যে, "আবু জাহাম কোন সময় তাঁহার কাঁধ হইতে লাঠি নামান না"। এই কথার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধিকাংশ সময়ের আচরণকে রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বকালীন আচরণরূপে অভিহিত করিয়াছেন। এই হাদীস অনুসারে তোতা বিক্রেতার এই উক্তি যে, আমার পাখী কখনও চুপ থাকে না, আমি এই তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছি যে, কখনও চুপ না থাকার অর্থ অধিকাংশ সময় চুপ না থাকা।

ইমাম মালিক তদীয় ছাত্র শাফেয়ীর বক্তব্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন এবং ছাত্রের প্রদত্ত ফতওয়াকেই বলবৎ রাখিলেন।

গ্রন্থ পরিচয়

মুল্লা আলী কারী হানাফী মিরকাত নামক মিশকাতের ভাষ্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ী বিভিন্ন শাস্ত্রে একশত তের খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইবনে যুলাক বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী ইসলামের মূলনীতি (অসূলে দ্বীন) সম্পর্কে চৌদ্দ খণ্ড আর ব্যবহারিক ফিকহে শতাধিক খণ্ড পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইমাম শাফেয়ীর ভূবন বিখ্যাত কিতাবুল উম্ম নামক পুস্তকসহ যে সকল গ্রন্থ মিসরের বুলাকে মুদ্রিত হইয়াছে এবং যে গুলির নাম হাফিয ইবনে হজর আসকালানী ইমাম শাফেয়ীর জীবনীতে উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য ঃ

আহকামুল কুরআন, মুসনদে ইমাম শাফেয়ী, ইখতিলাফুল হাদীস, জুম্মাউল ইলম, ইবতালুল ইসতিহসান, কিতাব সিয়ারুল আওযায়ী, কিতাব আরান্দো আ'লা মুহাম্মদ বিনিল হাসান, কিতাব ইখতিলাফ আবু হানীফা ওয়া ইবনো আবি লাইলা, কিতাব ইখতিলাফ মালিক ওয়াশ শাফেয়ী, কিতাব ইখতিলাফ আলী ওয়া ইবনে মসউদ, কিতাব সিয়ারুল ওয়াকেদী, কিতাবুল উম, কিতাবুল কুরআ, কিতাবুর রিসালা, রিসালা কাদীমা, রিসালা জাদীদা, কিতাবুসসুনন ও কিতাবুল মাবসূত।

কিতাবুল-উম্ম

সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে ইমাম শাফেয়ীর শাহকার (Masterpiece) হইতেছে তাঁহার কিতাবুল উম্। এই গ্রন্থখানা রচনা করার জন্য তিনি চারি বৎসর কাল

পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইমাম সাহেবের অপ্রতিদ্বন্দী বিদ্যাবত্তা ও কুশাগ্র প্রজ্ঞার বহুল পরিচয় এই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় বিদ্যমান রহিয়াছে। বহু বিদ্বান ব্যক্তি এই অমূল্য গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া ইজতিহাদের আসনে সমারূঢ় হইয়াছেন। তিন হাজারেরও অধিক পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

সিয়ারুল আওযায়ী

ইমাম আবদুর রহমান বিনে আম্র আল্ আওযায়ী ৮৮ হিযরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইমাম আবু হানীফার (রহ) সাত বৎসর পর পরলোকপ্রাপ্ত হন। সিরিয়া ও স্পেনে তাঁহারই ফিকহ্ প্রচলিত ছিল। তিনি সত্তর হাজার জিজ্ঞাসার উত্তর একক ভাবে প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র মযহবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ইমাম আযম আবু হানীফার অনেকগুলি সিদ্ধান্তের খণ্ডন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইমামে আযমের প্রিয় ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসান ইমাম আওযায়ীর খণ্ডনগুলির প্রতিবাদ লিখিয়াছিলেন। ইমাম শাফেয়ী যে গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদের উপরিউক্ত প্রতিবাদের সমুচিত জওয়াব লিখিয়াছিলেন এবং ইমাম আওযায়ীর সমর্থন করিয়াছিলেন তাহার নাম সিয়ারুল আওযায়ী।

ইখতিলাফে মালিক

ইমাম শাফেয়ী শুধু ইমাম আবু হানীফার (রহ) মত খন্ডন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি স্বীয় উসতায ইমাম মালিক বিনে আনাসের সঙ্গেও মতভেদ করিয়াছেন এবং প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ইমাম মালিক আপন যুগের অদ্বিতীয় মহা মনীষী হইলেও অভ্রান্ত নহেন। ইমাম শাফেয়ী এই গ্রন্থের সূচনায় এই সূত্রটি নির্দেশিত করেন যে, একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি অপর বিশ্বস্তের নিকট হইতে সংলগ্ন রেওয়ায়তের সাহায্যে যদি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস রেওয়ায়ত করেন তাহা হইলে উহাকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বলিয়া অবশ্যই গ্রাহ্য করিতে হইবে এবং রসূলুল্লাহর (সা) কোন প্রমাণিত হাদীস- উহার বিরুদ্ধে অপর কোন হাদীস না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই পরিত্যাগ করা যাইতে পারিবে না। বিরোধের অবস্থায় একটি হাদীস যদি অপরটির সংশোধক বলিয়া বুঝিতে পারা যায় তাহা হইলে সংশোধক হাদীসটির অনুসরণ এবং অন্যটিকে বর্জন করা হইবে। আর যদি একটিকে অপরটির সংশোধক বলিয়া না বুঝা যায় তাহা হইলে যে হাদীসের রেওয়ায়ত প্রামাণিকতার দিক দিয়া অধিকতর বিশুদ্ধ হইবে সেইটির অনুসরণ করিতে হইবে। আর উভয়-হাদীসই যদি তুল্যভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে হাদীসটির সমর্থন কুরআনে অথবা অন্য কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যাইবে তাহাই অনুসরণযোগ্য বিবেচিত হইবে। আর যদি সাহাবা বা

তাবেয়ীগণের কোন সিদ্ধান্ত রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের প্রতিকূল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে সকল অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসকেই অগ্রগণ্য এবং বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করিতে হইবে। -[কিতাবুল উম (৭) ১৭৭ পৃষ্ঠা।]

এই সূত্র স্থিরীকৃত করার পর ইমাম শাফেয়ী লিখিয়াছেন যে, ইমাম মালিক কতিপয় মসআলায় উপরিউক্ত নিয়মের অনুসরণ করিয়াছেন এবং কতকগুলি ব্যাপারে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন। যে সকল মসআলায় ইমাম মালিক শুধু একজন সাহাবা বা তাবেয়ী অথবা শুধু নিজের ব্যক্তিগত কিয়াসের অনুসরণ করিয়া বিশুদ্ধ হাদীস বর্জন করিয়াছেন এবং স্বীয় অভিমতের পোষকতায় অলীক ইজমার দাবী করিয়াছেন, অতঃপর ইমাম শাফেয়ী এই গ্রন্থে ইমাম মালিকের সেই সকল মসআলার অবতারণা করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী স্বীয় উসতায ইমাম মালিকের প্রতিবাদে লেখনী ধারণ করিলেন কেন, তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করিয়াছি। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন এবং হাফিয ইবনে হজর যাহা উধৃত করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট বলিয়া আমরা বিবেচনা করিতে পারি। ইমাম সাহেব বলিয়াছেন,

إن مالكا بشر يُخطئ ولا أخالف إلا من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

"ইমাম মালিক শেষ পর্যন্ত মানুষই ছিলেন। কাজেই তাঁহারও ভুল ভ্রান্তি ঘটিত এবং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের বিরোধ করিয়াছে আমি শুধু তাহারই বিরোধ করিয়া থাকি। [তওয়ালি উত্তাসীস]।"

ইখতিলাফ মুহাম্মদ বিনুল হাসান

এই গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ী স্বীয় উসতায-ভ্রাতা এবং উসতায ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের খন্ডন করিয়াছেন। ইমাম মুহাম্মদ স্বীয় উসতায আবু হানীফার সমর্থনে সর্বদা মদীনার ইমাম মালিক বিনে আনসের প্রতিবাদে ব্যাপৃত থাকিতেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী মনাকীব গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ী স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি ৬০ সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইমাম মুহাম্মদের গ্রন্থগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম এবং বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেগুলি পাঠ করার পর তাঁহার ভ্রান্তিসমূহ প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম।

ইখতিলাফুল হাদীস

এই গ্রন্থে বিভিন্ন হাদীসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের নিয়ম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ইবতালুল ইসতিহসান

কুরআন, সুন্নাত ও ইজমা বিরোধী অভিমতের খণ্ডন।

কিতাবুর্‌রিসালা

স্বনামধন্য আহলে হাদীস ইমাম আব্দুর রহমান বিনে মাহদী ইমাম শাফেয়ী অপেক্ষা পনের বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাহা স্বত্বেও তিনি ইমাম শাফেয়ীকে কুরআন ও হাদীস এবং ইজমা ও কিয়াসের সাহায্যে কিভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহার নিয়ম এবং নাসিখ ও মনসুখ এবং অমুম ও খসূসের পরিচয় লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধক্রমে ইমাম সাহেব এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন। আল্লামা আবুল কাসিম আনমাতী বলেন যে, "ইমাম শাফেয়ীর এই অমূল্য গ্রন্থখানা আমি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বারংবার পাঠ করিয়াছি এবং যতবার অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি তত বারই উহার মধ্যে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

এই দীন লেখকের অশেষ সৌভাগ্য যে, সে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সন্দর্শন এবং পঠনের সুযোগ লাভ করিয়াছে এবং এই গ্রন্থগুলি তাহার পুস্তকাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। ইমাম সাহেবের অন্যান্য গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হইয়াছে কিনা, আমি তাহা অবগত নই-এমন কি তন্মধ্যে যেগুলি পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে সেগুলির সংবাদ সরবরাহ করাও আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

ইমাম শাফেয়ীর মযহব ও উক্তি

(ক) ইমাম সাহেবের অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র বুওয়ায়তী তাঁহার উসতাযের এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম সাহেব বলিয়াছেন,

عليكم بأصحاب الحديث، فإنهم أكثر صوابا من غيرهم، وقال : إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث، فكأنما رأيت رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ! جزاهم الله خيرا، هم حفظوا لنا الأصل، فلهم علينا الفضل -

তোমরা আহলে হাদীসগণের দলভুক্ত থাকিও, কারণ তাঁহারা অন্যান্য দল অপেক্ষা অধিকতর সঠিক পথের পথিক। ইমাম সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, কোন আহলে হাদীস বিদ্বানের সন্দর্শন লাভ রাসূলুল্লাহর (সা) সহচরবৃন্দের সন্দর্শন লাভের তুল্য। আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করুন! তাঁহারাই আমাদের জন্য ধর্মের মূল বস্তু রক্ষা করিয়াছেন এবং এই জন্যই তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর- [তওয়ালি-উত্তাসীস, ৬৪ পৃঃ (বুলাক)]

(খ) ইমাম শা'রানী ও ভারত গুরু শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী স্ব স্ব গ্রন্থে উধৃত করিয়াছেন যে, একদা ইমাম শাফেয়ী তদীয় ছাত্র ইমাম মুযানীকে বলিলেন,

يا ابراهيم ، لا تقلدنى فى كل ما أقول وانظر فى ذلك لنفسك فانه دين -

দেখ ইবরাহীম, আমার প্রত্যেকটি কথার তুমি অন্ধভাবে অনুসরণ (তকলীদ) করিও না। তুমি নিজেও বিবেচনা করিয়া দেখিবে, কারণ ইহা দীনের ব্যাপার।

(গ) তাঁহারা ইমাম শাফেয়ীর একথাও উধৃত করিয়াছেন যে,

لا حجة فى قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كثروا، لا فى قياس ولا فى شئى -

রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত কাহারও কথাই দলীল নয়। তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হইলেও নয়। কিয়াস অথবা অন্য কোন বিষয়েও নয়- ইয়াওয়াকীৎ ওয়াল জওয়াহির (২) ২৪৩ পৃঃ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ঃ ১৬৩ পৃ, ইকদুল জীদ, ৮১ পৃঃ।]

(ঘ) ইমাম সাহেব আরও বলিয়াছেন,

انظروا فى أمر دينكم ، فإن التقليد المحض مذموم وفيه عمى للبصيرة، وكان يقول أيضا : قبيح على من أعطى شمعة ليستضئ بها أن يطفئها ويمشى فى الظلام -

তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপার স্বয়ং বিবেচনা করিয়া দেখিও, কারণ শুধু তকলীদ অর্থাৎ অন্ধ অনুসরণ দূষণীয় ব্যাপার, ইহা জ্ঞানের অন্ধত্ব। যাহাকে আলোর জন্য বাতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার পক্ষে উক্ত বাতি নির্বাপিত করিয়া অন্ধকারে চলা অত্যন্ত নিন্দনীয়-মিনহাজুল মুবীন (আমল বিল হাদীস, মহদী আলী ৮৩ পৃ.)।

(ঙ) ইমাম বয়হকী শাফেয়ীর প্রমুখাত তাঁহার এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে,

مثل الذى يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل، يحمل حزمة حطب وفيه افعى تلدعه وهو لا يدرى -

প্রমাণবিহীন অভিজ্ঞতা যে অর্জন করিতে চায় তাহার অবস্থা অন্ধকারে জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহকারীর ন্যায়। খড়ির বোঝা সে বহন করিয়া চলিয়াছে, আর তাহার মধ্য হইতে একটি সাপ তাহাকে দংশন করিয়াছে, অথচ সে সাপের কথা কিছুই জানে না- [ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন (২) ৩০১ ও ৩০৯ পৃ।]

(চ) শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ ইমাম সাহেবের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে,

اذا رايت الحجة موضوعة على الطريق، فهو قولى !

প্রমাণ যদি পথে কুড়াইয়া পাও, উহাকেই আমার সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে- [ফতাওয়া (২) ৩৮৪ পৃঃ।]

(ছ) ইমাম মুযানী তদীয় মুখ্‌তসর নামক ফিক্‌হ গ্রন্থের সূচনায় লিখিয়াছেন যে,

اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن ادريس الشافعى (رح) ومن معنى قوله لا قربة على من أراده مع أعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره ينظر فيه لدينه و يحتاط فيه لنفسه !

আমি মুহাম্মদ বিনে ইদরীস শাফেয়ী রাহেমাহুল্লাহর মযহবের সার সংকলন এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলাম, যাহাতে এই বিদ্যা যাহারা আয়ত্ব করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য হয়।

ইমাম সাহেবের এই ঘোষণাও আমি প্রচার করিতেছি যে, তিনি তাঁহার নিজের এবং অপর বিদ্বানের তকলীদ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন এবং নিজের দীনের ব্যাপারে স্বয়ং বিবেচনা করিয়া দেখিতে এবং সতর্ক হইয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন-[মুখ্‌তসর মুযানী (১) ১ম পৃঃ (কিতাবুল উম্ম সহ-বুলাক প্রেসে মুদ্রিত)।]

(জ) ইমাম সাহেবের অন্যতম ছাত্র হরমলা তুজীবী বলেন,

كل ماقلت وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولى مما يصح، فحديث النبى صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدونى -

শাফেয়ী বলিয়াছেন, আমার কোন উক্তি যদি রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশের প্রতিকূল দেখিতে পাও, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস অনুসরণীয় হইবে! তোমরা আমার উক্তির তকলীদ করিবে না- [আবু শামামুমেল-৩৮ পৃ।]

(ঝ) হুসাইন করাবিছীকে একদা ইমাম শাফেয়ী বলিলেন যে,

ان أصبتم الحجة فى الطريق مطروحة، فاحكم بها عنى فانى القائل بها -

যাহা প্রকৃত দলীল, তাহাকে যদি তোমরা পথের মাঝখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখিতে পাও, তাহা হইলে আমার নামে তোমরা তদনুসারেই ব্যবস্থা দিও। আমি উহার কথক। [ঐ]

(ঞ) ইমাম শাফেয়ী স্বীয় কিতাবুল উম্ম নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,

إنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالإستدلال -

রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত অন্য কোন বিদ্বানের পক্ষে প্রমাণ প্রয়োগ ছাড়া কোন কথা বলা বৈধ নয়-[রশীদ রিযা, মুহাবিরাৎ, ১০৭ পৃঃ]

(ট) একদা তিনি স্বীয় ছাত্র রুবাইয়অকে বলিলেন,

يا أبا اسحق ، لا تقلدنى فى كل ما أقول، وانظر فى ذلك لنفسك فانه دين -

ওগো ইসহাকের পিতা, আমার প্রত্যেকটি কথার তকলীদ করিও না, তুমি নিজেও বিবেচনা করিয়া দেখ। কারণ ইহা দীনের ব্যাপার- [মীযানুল কুবরা (১) ৬৩ পৃ।]

(ঠ) ইমাম সাহেব স্বীয় গ্রন্থ- রিসালায় লিখিয়াছেন,

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله ومن جهة العلم بعد الكتاب فالسنة،

فالاجماع والأثار ثم ماوصفت من القياس عليها وهو غير الإستحسان -

রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত পূর্ববর্তী বিদ্যার আশ্রয় না লইয়া অথবা কুরআনের পর সুন্নাত এবং অতঃপর ইজমা ও আসারের সাহায্য বর্জন করিয়া কোন ব্যক্তিকে কথা বলার অধিকার আল্লাহ প্রদান করেন নাই। এইগুলির পর হইতেছে আমি যে কিয়াসের কথা বলিয়াছি উহার স্থান এবং উহা ইস্তিহ্সান নয়- [কিতাবুর রিসালা, ১৩৫ পৃঃ।]

(ভ) খতীব বাগদাদী ইমাম শাফেয়ীর নিম্নলিখিত উক্তি উধৃত করিয়াছেন ঃ

لايحل لأحد أن يفتى فى دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريدبه ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ماعرف من القرأن ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرأن ويستعمل هذا مع الأنصاف ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى فى الحلال والحرام -

যে ব্যক্তি আল্লাহর গ্রন্থের বিদ্যায় উহার সংশোধক ও সংশোধিত, সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট অংশের, উহার ব্যাখ্যা এবং অবতরণ, উহার মক্কী এবং মদ্নী আয়ত সমূহের এবং উহার তাৎপর্যের পাণ্ডিত্য অর্জন করে নাই এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস সম্পর্কেও উহার নাসিখ্ ও মনসুখ এবং কুরআনের মত হাদীস সম্পর্কিত অন্যান্য বিদ্যাসমূহে অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাই এবং অভিধান ও কাব্যে কুরআন ও হাদীস হৃদয়ঙ্গম করার উপযোগী এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত উহা প্রয়োগ করার মত বুৎপত্তি লাভ করে নাই এবং এই সমস্তের পর বিভিন্ন নগর সমূহের বিদ্বানগণের মতভেদ অবগত হয় নাই এবং গবেষণা কার্য্যের প্রকৃতিগত যোগ্যতা যাহার ভিতর নাই, এরূপ- ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর দীন সম্পর্কিত ব্যাপারে নিষ্পত্তি করা বৈধ হইবে না। এই সকল বিদ্যায় যে ব্যক্তি পারদর্শী, কেবল তাঁহারই পক্ষে হালাল ও হারাম সম্বন্ধে ফত্ওয়া দান করা বিধেয় হইবে- [ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন, (১) ৫২ পৃঃ।][৪]

---

[৪]সমস্যার সমাধান কার্যের জন্য যোগ্যতার যে মাপকাঠি হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, আধুনিক হাদীস বিদ্বেষী, শরীঅত অনভিজ্ঞ, ধর্মহীন সংস্কারক, শাসনকর্তা ও নেতাদের

(চ) বয়হকী ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলের মধ্যস্থতায় ইমাম শাফেয়ীর উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে,

القياس عند الضرورة ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم فى نفس الأمر وإنما عليه بذل الوسع فى الاجتهاد يوجر ولو أخطأ -

শুধু বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই কিয়াসের আশ্রয় লইতে হয় কিন্তু ইহা সত্বেও কিয়াসকারীর পক্ষে ইহা বলা সম্ভবপর নয় যে, সে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ও অভ্রান্ত। তাঁহার পক্ষে শুধু গবেষণার জন্য সকল শক্তি প্রয়োগ ছাড়া অন্য পন্থা নাই এবং এই গবেষণাকার্যে তাহার ভ্রান্তি ঘটিলেও সে পুরস্কৃত হইবে- [ফত্হুল বারী (১৩) -২৪৫ পৃ।]

(ণ) রুবাইয়া বিনে সুলায়মান বলিতেছেন,-একদা জনৈক ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ীকে একটি মসআলা জিজ্ঞাসা করিল, আমিও

তথায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রবণ করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসাকারীর জওয়াবে ইমাম শাফেয়ী বলিলেন, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) এই নির্দেশ বর্ণিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসাকারী পুনরায় বলিল, আপনার ফত্ওয়াও কি ইহাই?

فار تعد الشافعى واصفر وحال لونه، وقال : ويحك: وأىّ أرض تقلنى وأىّ سماء تظلنى إذا رويت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم اقل به ؟ نعم على الرأس والعين !

"জিজ্ঞাসাকারীর এই কথা শ্রবণ করিয়া ইমাম শাফেয়ী চমকিয়া উঠিলেন এবং বিবর্ণ হইলেন। মনে হইল যেন তাঁহার দেহের রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে। ইমাম সাহেব বলিয়া উঠিলেন, ওরে হতভাগা আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কোন হাদীস বর্ণনা করার পর যদি তদনুসারে ফত্ওয়া না দেই, তাহা হইলে কোন্ মাটি আমার ভার বহন এবং কোন্ আকাশ আমাকে আচ্ছাদিত করিবে? হাঁ! হাঁ! রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস আমার মস্তক ও চক্ষুর উপর, উহাই আমার মযহব।" [ইকাযুল হিমম, ১০০ পৃঃ।]

বিদ্যাবত্তা ও প্রগলভতা এবং হস্তিমূর্খ ইলমে দীনের ঠিকাদারদের যোগ্যতা ও ফত্ওয়াবাজীর দুঃসাহসিকতার সহিত তাহার তুলনা করিলে ইসলামের হৃদয়বিদারক দুরবস্থা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারিবে-

لمثل هذا فليذب القلب من كمد،
إن كان فى القلب إسلام وإيمان !

(ত) ইমাম সাহেবের উল্লিখিত ছাত্র ইমাম রুবাইয়া বিনে সুলায়মান বলেন যে, আমি একদা ইমাম শাফেয়ীকে এই কথা বলিতে শুনিলাম যে,

إذا وجدتم فی کتابی خلاف سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم ودعوا ماقلت !

তোমরা আমার গ্রন্থে যদি কোন কথা রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের প্রতিকূল দেখিতে পাও, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত অনুসারে ব্যবস্থা প্রদান করিও এবং আমার ফত্ওয়া প্রত্যাখ্যান করিও -- [ঐ, ঐ]

(থ) ইমাম হুমায়দী বলেন যে, জনৈক ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ীকে একটি মস্আলা জিজ্ঞাসা করিল, তদুত্তরে ইমাম সাহেব রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস পাঠ করিলেন। লোকটি বলিল,

أتقول بهذا یا أبا عبد الله ؟ فقال الشافعی : أر أیت فی وسطی زنارا؟ أتر انی خرجت من الکناسة؟ أقول : قال النبی صلی الله علیه وسلم وتقول لی : أتقول بهذا ؟ أروی عن النبی صلی الله علیه وسلم ولا أقول به ؟

এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি? ইমাম শাফেয়ী বলিলেন, তুমি কি আমার কোমরে পৈতা দেখিয়াছ? তুমি কি আমাকে কোন গির্জা হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়াছ? আমি বলিতেছি ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ বলিয়াছেন, আর তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ এ বিষয়ে আমার অভিমত কি? তুমি কি মনে কর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস রেওয়ায়ত করিব অথচ আমার অভিমত উহার প্রতিকূল হইবে?-(ঐ ১০৪ পৃঃ)

(দ) রুবাইয়া ইমাম শাফেয়ীকে বলিতে শুনিলেন যে,

کل مسألة صح فیها الخبر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها فی حیاتی وبعد موتی -

যে কোন মস্আলায় রাসূলুল্লাহর (সা) সহীহ হাদীস প্রমাণিত হইবে সেই সকল হাদীসের পরিপন্থী আমার সমুদয় উক্তিকে আমি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর প্রত্যাহার করিয়া লইতেছি- [ঐ ১০৪ পৃঃ

(ধ) ইমামুল আয়েম্মা শাফেয়ী স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

وقد سن رسول الله صلی الله علیه وسلم مع کتاب الله ، وسن فیما لیس فیه بعینه نص کتاب، وکل ماسن فقد ألزمنا الله اتباعه

وجعل فی اتباعه طاعته وفی العنود عن اتباعه معصیة التی لم یعذبها خلفاء ولم یجعل له من اتباع سنن رسول الله صلی الله عیه وسلم مخرجا لما وصفت -

রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআনের সংগে সংগে অনেকগুলি বিষয় প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত নির্দেশ সমূহের মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় রহিয়াছে, যেগুলি স্পষ্টভাবে কুরআনে উল্লিখিত হয় নাই এবং যাহাই রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবর্তিত করিয়াছেন- আল্লাহ আমাদের জন্য সেগুলি অবশ্য প্রতিপালনীয় বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশের অনুসরণ কার্যকে আল্লাহ তাঁহার আনুগত্য এবং রাসূলুল্লাহ (সা) অনুসরণের অবাধ্যতাকে আল্লাহ স্বীয় বিদ্রোহ ও পাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং এই অবাধ্যতার জন্য মানুষের কোন আপত্তিই তিনি গ্রাহ্য করেন নাই এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের অনুসরণ হইতে মুক্ত হওয়ার কোন উপায়ই আল্লাহ রাখেন নাই- (কিতাবুর রিসালা, ২৭ পৃঃ।)

হাফিয ইবনে হযর তাওয়ালি-উত্তাসীস গ্রন্থে, হাফিয ইবনুল কাইয়েম ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন গ্রন্থে, শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা গ্রন্থে এবং আল্লামা ফুল্লানী ঈকাযুল হিমম পুস্তকে ইমাম শাফেয়ী রাহেমাহুল্লাহর এই বহু বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, ইমাম সাহেব প্রায়শঃ বলিতেন,

إذاصح الحدیث فهو مذهبی وإذا رایتم کلامی یخالف الحدیث فاعملوا بالحدیث واضربوا بکلامی الحائط -

হাদীস বিশুদ্ধ প্রতিপন্ন হইলেই উহা আমার মযহব এবং তোমরা যদি আমার কোন উক্তি হাদীসের খেলাপ দেখিতে পাও, তাহা হইলে হাদীসের অনুসরণ করিও এবং আমার উক্তি প্রাচীরের বাহিরে ফেলিয়া দিও- [হুজ্জাতুল্লাহ (১) ১৬৩ পৃঃ ঈকায-১০৭ পৃঃ} ।

ইমাম শাফেয়ীর মযহব ও অভিমত

(ন) রুবাইয়া বলেন যে, একদা ইমাম শাফেয়ী বলিলেন, এমন কোন ব্যক্তি যাহার বিদ্যার সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে অথবা জনগণ যাহাকে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে অথবা যিনি স্বয়ং নিজেকে বিদ্বানগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তিনি কখনও এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন নাই যে, আল্লাহ তদীয় রাসূলের (সা) আদেশ অনুসরণ করা এবং তাঁহার শাসন মান্য করা ফরয করিয়াছেন,

কারণ- রাসূলুল্লাহর (সা) পর এমন কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসরণ করিতে আদিষ্ট হন নাই এবং আল্লাহর গ্রন্থ এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নত ছাড়া কোন ব্যক্তির উক্তিই অবশ্য প্রতিপালনীয় বলিয়া নির্দেশিত হয় নাই। সমস্ত কথাকেই কুরআন ও সুন্নাতের অধীনস্ত বিবেচনা করিতে হইবে। আল্লাহ আমাদের প্রতি এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস গ্রহণ করা ফরয করিয়াছেন। মাত্র একটি দল এই ব্যবস্থার অন্যথাচরণ করিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহর (সা) যে হাদীস দুই একজন মাত্র রাবীর প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রামাণিকতা সম্পর্কে আহলে কালামের দল বিভিন্ন মতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই ভাবে জনগণ যাহাদের ফকীহ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদেরই কেহ কেহ সত্যানুসন্ধিৎসার পথ পরিহার করিয়া গতানুগতিকতা (তকলীদ) বিভ্রান্তি প্রাধান্যস্পৃহার পথ গ্রহণ করিয়াছেন।

(প) ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন, যে, একদা ইমাম শাফেয়ী আমাকে বলিলেন যে, দেখ! যদি কোন হাদীস তোমাদের কাছে বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমাকে সেই হাদীসের কথা জ্ঞাপন করিবে, যাহাতে আমি উহার অনুসরণ করিতে পারি। ইমাম আহমদ আরও বলিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর যে আচরণ আমার চক্ষে সর্বাপেক্ষা সুন্দর বিবেচিত হইত তাহা এই যে, তাঁহার অজ্ঞাত কোন হাদীস যদি তিনি শ্রবণ করিতেন তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিতেন এবং স্বীয় ব্যক্তিগত অভিমত প্রত্যাহার করিয়া লইতেন।

(ফ) রুবাইয়া বলিলেন যে, ইমাম শাফেয়ী একদা আমাকে আদেশ করিলেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস কোনক্রমেই পরিহার করিও না, উহার ভিতর কিয়াসের স্থান নাই এবং কোন অবস্থাতেই কিয়াস সুন্নাতের সম-আসন অধিকার করার যোগ্য নয়।

(ব) রুবাইয়া বলেন, আমি একদা ইমাম শাফেয়ীকে নামাযে হস্তোত্তোলন (রফউল ইয়াদায়েন) করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,

يرفع المصلى يديه إذا افتتح الصلوة حذو منكبيه و إذا أراد أن يركع و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، و لا يفعل ذلك فى السجود -

নামাযী যখন নামায আরম্ভ করিবে তখন সে তাহার উভয় হস্ত স্কন্ধ পর্যন্ত উত্তোলন করিবে এবং যখন রুকু করিতে উদ্যত হইবে এবং রুকু হইতে মস্তক উত্তোলন করিবে তখনও অনুরূপ ভাবে রফউল ইয়াদায়েন করিবে। কিন্তু সিজদায় এরূপ করিবে না।

রুবাইয়া বলিলেন, একথার প্রমাণ কি?

ইমাম শাফেয়ী বলিলেন,

أنبانا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل قولنا -

সুফয়ান ইবনে উআয়না আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুহরী আব্দুল্লাহ বিনে উমরের পুত্র সালিমের প্রমুখাৎ এবং তিনি স্বীয় পিতার বাচনিক অবগত হইয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের এই উক্তির অনুরূপই আদেশ করিয়াছেন।

রুবাইয়া বলিলেন, আমরা কিন্তু বলিয়া থাকি যে, নামাযী কেবল নামাযের সূচনাতেই হস্তোত্তোলন করিবে, পুনশ্চ আর করিবে না।

ইমাম শাফেয়ী বলিলেন,

أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلوة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما -

ইমাম মালিক আমার নিকট নাফেয়ের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আব্দুল্লাহ বিনে উমর যখন নামায আরম্ভ করিতেন, তখন স্কন্ধ পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন করিতেন এবং যখন রুকু হইতে মাথা তুলিতেন তখনও।

শাফেয়ী বলিলেন, তুমি দেখিতেছ, ইমাম মালিক স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিতেছেন যে, হযরত (সা) নামাযের প্রারম্ভে স্কন্ধ পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন করিতেন এবং রুকু হইতে মস্তক উঠাইবার সময়েও হস্ত উত্তোলন করিতেন। কিন্তু তোমরা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) এবং ইবনে উমরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ আর বলিতেছ যে, নামাযের সূচনা ব্যতীত অন্য সময়ে হস্তোত্তোলন করা হইবে না। অথচ তোমরাই রেওয়ায়ত করিতেছ যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং ইবনে উমর নামাযের সূচনায় এবং রুকু হইতে মাথা উঠাইবার সময় হস্তোত্তোলন করিতেন। কোন বিদ্বানের পক্ষে নিজের ব্যক্তিগত মতের অনুসরণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং ইবনে উমরের আচরণের অনুসরণ বর্জন করা কি জায়েয হইতে পারে? তারপর তৃতীয় ক্ষেত্রে ইবনে উমরের কথা সূত্রে তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রমুখাৎ যাহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন তাহা কেমন করিয়া ছাড়া হইল? তাঁহার বর্ণিত হাদীসের কতকাংশ গৃহীত আর কতকাংশ পরিত্যক্ত হইল কেন? রাসূলুল্লাহর (সা) প্রমুখাৎ দুইবার অথবা তিনবার হস্তোত্তোলন করার হাদীস রেওয়ায়ত করা যদি ইমাম মালিকের পক্ষে বৈধ হইয়া থাকে এবং ইবনে

উমরের প্রমুখাৎ যদি দুইবার হস্তোত্তোলন করা তিনি রেওয়ায়ত করিয়া থাকেন এবং তন্মধ্যে এক বার হস্তোত্তোলন করার হাদীস যদি তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে যাহা তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন কাহারও পক্ষে তাহা গ্রহণ করা বা যাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বর্জন করা সঙ্গত হইবে কি? সর্বোপরি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রমুখাৎ যাহা বর্ণিত হইয়াছে অন্য কাহারও পক্ষে তাহা পরিহার করা বৈধ হইবে কি? রুবাইয়া বলিলেন, আমাদের ইমাম মালিক বলিয়াছেন,- হস্তোত্তোলন করার তাৎপর্য কি? শাফেয়ী বলিলেন, হস্তোত্তোলন করার তাৎপর্য হইতেছে, আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) সুন্নাতের অনুসরণ। নামাযের সূচনায় হস্তোত্তোলন করার যে অর্থ, রুকুতে যাইবার প্রাক্কালে এবং রুকু হইতে মাথা উঠাইবার সময়েও [অর্থাৎ যে দুই ক্ষেত্রে হস্তোত্তোলন করা সম্পর্কে তোমরা আল্লাহর রাসূলের (সা) বিরোধ করিয়াছ] তাহার অর্থ উহাই। অধিকন্তু তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এবং ইবনে উমর-উভয়ের প্রমুখাৎ তোমাদেরই রেওয়ায়তের তোমরা একই সঙ্গে বিরোধ করিতেছ অথচ রফউল ইয়াদায়েনের হাদীস রাসূলুল্লাহর (সা) বহু গণ্যমান্য সাহাবী ইহার অনুসরণ করিতেন। সুতরাং যে ব্যক্তি রফউল ইয়াদায়েন পরিত্যাগ করিবে সে সুন্নাতের পরিত্যাগকারী হইবে।

ইমাম আহমদ ইমাম শাফেয়ীর প্রমুখাৎ এই রেওয়ায়তই করিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, রুকুতে যাওয়ার প্রাক্কালে এবং রুকু হইতে উঠার সময়ে যে ব্যক্তি রফউল ঈয়াদায়েন বর্জনকারী, সে আল্লাহর রাসূলের (সা) সুন্নাতের বর্জনকারী।

(ম) হজ্জের সময়ে ইহ্‌রামের পূর্বে যদি সুগন্ধি ব্যবহার করা হয় এবং উহার গন্ধ যদি ইহ্‌রামের পর অথবা জমরাতে প্রস্তরাঘাতের পর অথবা মস্তক মুণ্ডনের পর অথবা তওয়াফে ইফাযার পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট রহিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা সম্পর্কে রুবাইয়া ইমাম শাফেয়ীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয। আমি ইহা পছন্দ করি এবং আমি ইহাকে দুষণীয় মনে করি না। কারণ রাসূলুল্লাহর (সা) (সুন্নাতে ইহা প্রমাণিত রহিয়াছে এবং একাধিক বিশিষ্ট সাহাবা এরূপ করিয়াছেন। রুবাইয়া একথার প্রমাণ চাহিলে ইমাম শাফেয়ী হাদীস এবং 'আসার' আবৃত্তি করিয়া শোনান এবং বলেন, ইবনে উআয়না আমার নিকট আমর বিনে দীনারের প্রমুখাৎ এবং তিনি সালিমের বাচনিক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর বলিয়াছেন, জমরায় প্রস্তর নিক্ষেপ করার পর স্ত্রী সহবাস ও সুগন্ধি ব্যবহার ব্যতীত সমুদয় নিষিদ্ধ কার্যকলাপ হালাল হইয়া যায় এবং মা আয়েশা বলিতেছেন, তওয়াফে ইফাযার

পূর্বেই (জমরায় প্রস্তর নিক্ষেপের পর মীনা হইতে আসিয়া বয়তুল্লাহ শরীফ প্রদক্ষিণ করার কার্যকে তওয়াফে ইফাযা বলা হয়) আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) কে সুগন্ধি মাখাইয়াছিলাম। আবদুল্লাহ বিনে উমরের পুত্র সালিম বলিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতই অনুসরণের অধিকতর যোগ্য। অর্থাৎ সালিম স্বীয় পিতামহ দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুকের ফতওয়া রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীসের সমক্ষতায় বর্জন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। ইমাম শাফেয়ী সালিমের উক্তি প্রসঙ্গে বলিতেছেন, সাধু সজ্জন এবং বিদ্বানগণের আচরণ এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় আর যাহারা ব্যক্তিগত অভিমতের অনুসরণ করিয়া সুন্নাতের নির্দেশ বর্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ বিদ্বানগণের উক্তি স্ব স্ব বিদ্যা ও বিবেচনা অনুসারে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় হইবে।

(য) ইমাম শাফেয়ী ঋণগ্রস্তের সম্পত্তি বিক্রয় সম্পর্কে যে ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন, তদুত্তরে জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে বলেন যে, আপনি আপনার কোন কোন উসতাযের বিরোধ করিলেন। ইমাম শাফেয়ী স্বীয় পুরাতন গ্রন্থে (যা আফরানীর মধ্যস্থতায় যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে) এই কথার জওয়াব লিখিয়াছেন যে, যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের অনুগমন করিয়াছেন আমি তাঁহার সহযোগী হইয়াছি এবং যিনি ভুল করিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন আমি তাঁহার বিরোধ করিয়াছি। যে সহচরকে আমি কখনও বর্জন করিব না তাহা রাসূলুল্লাহর (সা) সুদৃঢ় এবং সুপ্রমাণিত সাহচর্য এবং যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস অনুসারে ব্যবস্থা প্রদান করেন না তিনি আমার নিকটতম ব্যক্তি হইলেও আমি তাঁহাকে পরিহার করিব- (ই'লামুল মুআক্কেয়ীন, ঈকাযুল হিমম, ১০৪-১০৭পৃঃ)।

ইমাম শাফেয়ীর সমাধান পদ্ধতি

সমস্যার সমাধানকল্পে ইমাম শাফেয়ী যে পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ইমাম সাহেবের প্রাককালীন - ফিক্‌হ শাস্ত্রের(Islamic Jurisprudence) অবস্থা অবগত হওয়া আবশ্যক। তৎকালীন ফিক্‌হ শাস্ত্রের মোটামুটি অবস্থা ছিল এই যে, তখন পর্যন্ত ফিক্‌হের বাঁধাধরা নিয়ম ও মূলনীতি (Principles) সমূহ আবিষ্কৃত হয় নাই। ভুল ও সঠিক মসআলা সমূহের মধ্যে পার্থক্য করার কোন মানদণ্ডও স্থিরীকৃত ছিল না। বিভিন্নরূপী হাদীস সমূহের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করার এবং তাহাদের পারস্পরিক বিরোধ দূরীভূত করার কোন নিয়মও ছিল না। তৎকালীন ফকীহগণ সাধারণতঃ

মুর্সল ও মুনকাতা হাদীস সমূহের সাহায্যে মসআলাসমূহ আবিষ্কার করিতেন[৫] এবং বিরোধ ক্ষেত্রে স্বীয় ধীশক্তি ও মানসিক প্রবণতার (Mental tendency) উপর নির্ভর করিয়াই একটি হাদীসকে অগ্রাহ্য এবং অপরটিকে অগ্রগণ্য করিয়া তাহার অনুসরণ করিতেন। বহু ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস সমূহ পরিত্যাগ করিয়া যঈফ হাদীস সমূহের আশ্রয় লইতেন এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের অভিমত নিজেদের সিদ্ধান্তের পোষকতায় উপস্থাপিত করিতেন। শরীঅত বিরোধী কাল্পনিক অভিমতকে শরীঅতের অনুকূল বিশুদ্ধ কিয়াসের সহিত মিশাইয়া ফেলিতেন এবং এই কার্যকে ইসতিহসান নামে অভিহিত করিতেন। সংশোধন (নাসিখ) ও সংশোধিত (মনসুখ), ব্যাপক (মুত্লক) ও নির্ধারিত (মুকাইয়দ), সাধারণ (আম) ও বিশেষ (খাস), শর্ত ও পরিচয় (ওয়াস্ফ)– প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইত না, ফলে তৎকালীন বিদ্বানগণের ইজ্তিহাদ ও আবিষ্কারে নানারূপ বিভ্রান্তি ও বৈপরীত্য সংঘটিত হইত এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি পরস্পর অসংলগ্ন হইয়া পড়িত। ইমাম শাফেয়ী হানাফী ও মালেকী মযহবের অসূল ও ফরূ' (Principles & details) সমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত দুই মযহবে যে সকল বিষয়ের অভাব ঘটিয়াছিল সেগুলি পূর্ণ করেন এবং নূতন পদ্ধতিতে ফিক্হ শাস্ত্রের মূলনীতি ও বিধানগুলি সুসম্পাদিত করেন সর্ব প্রথম তিনিই অসুলে ফিক্হের এক খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং উহাতে বিভিন্ন রূপ হাদীস সমূহের মধ্যে সমন্বয় সংঘটিত করার নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। মূর্সল ও মুনকাতা হাদীস সমূহ গ্রহণ করার জন্য তিনিই যথোপযুক্ত শর্ত আবিষ্কার করেন। যে সকল মূলনীতিতে ইমাম শাফেয়ী হানাফী ও মালেকী মযহবের সহিত বিরোধ করিয়াছেন আমরা সেগুলির মোটামুটি বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

১। মূর্সল ও মুনকাতা হাদীসের উপর নির্ভর না করা

হানাফী ও মালেকী মযহবের মূর্সল ও মুনকাতা হাদীসে নির্ভর করা হয় দেখিয়া ইমাম শাফেয়ী এই নিয়ম স্থিরীকৃত করিলেন যে, যথোপযুক্ত শর্তের উপস্থিতি ব্যতিরেকে উল্লিখিত হাদীসসমূহ পরিগৃহীত হইবে না। কারণ হাদীসের তরিকাগুলি[৬] একত্রিত করার ফলে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, কতিপয় মূল হাদীস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উহা কতকগুলি মুসনদ হাদীসেরও বিপরীত।

---

[৫] যে হাদীসের সনদে বর্ণনাদাতা সাহাবীর নাম উল্লিখিত নাই অথচ হাদীসটি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, সেই রূপ হাদীসকে মূর্সল বলা হয়। আর যে হাদীসের সনদের মাঝখানে রাবীগণের সংলগ্নতা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা মুনকাতা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।- লেখক।

[৬] একই হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হইলে প্রত্যেকটি সনদের হাদীসকে একটি তরীকার হাদীস বলা হয়। এইরূপ বিভিন্ন তরীকার বহু হাদীস বিদ্যমান রহিয়াছে।

২। বিভিন্ন হাদীস সমূহের মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার নিয়ম প্রণয়ন করা

ইমাম শাফেয়ীর সময়ে হাদীসের যেরূপ প্রাচুর্য ঘটিয়াছিল তাঁহার পূর্বে হাদীসের অবস্থা সেরূপ ছিল না। তাঁহার পূর্বে প্রত্যেক নগরের অধিবাসীবৃন্দ শুধু স্ব স্ব নগরের বিদ্বান ও ইমামগণের নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। ইমাম শাফেয়ীর যুগে হাদীস সংকলনের কার্য আরম্ভ হইলে এক নগরের বিদ্বানগণ অপর নগরে গমন করিয়া হাদীস সংগ্রহ করিতে লাগিয়া যান। এই ভাবে বিভিন্ন নগর ও জনপদের ইমাম ও বিদ্বানগণের নিকট যে সকল হাদীস মওজুদ ছিল সেগুলির মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্যও পরিদৃষ্ট হয়। এই পার্থক্য ও বৈষম্য বিদূরিত করার উপায় অপরিহার্য হওয়ায় ইমাম সাহেব শুধু এই উদ্দেশ্যেই একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, উহাতে বিভিন্ন হাদীস সমূহের বৈষম্য বিদূরিত করার উপায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩। সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করার রীতি রহিত করা

পূর্বে যে সকল বিদ্বান ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব মযহব স্থাপন করিয়াছিলেন অনেকগুলি সহীহ হাদীস তখন পর্যন্ত তাঁহারা হস্তগত করিতে পারেন নাই। সুতরাং যে সকল হাদীসে স্পষ্ট ভাবে মস্আলা বিদ্যমান ছিল সেগুলি অবগত না থাকার ফলে তাঁহারা কিয়াস ও রায় এবং ইজ্তিহাদ ও আবিষ্কারের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইমাম শাফেয়ী দেখিতে পাইলেন যে, একান্ত বাধ্য হইয়াই পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ অনেক সহীহ হাদীসের অনুসরণ করিতে পারেন নাই। ইমাম শাফেয়ী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রচার করিলেন যে, সহীহ হাদীস প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিয়াস বর্জন করিয়া সহীহ হাদীসের অনুসরণ করিতে হইবে। তিনি ইহাও প্রমাণিত করিলেন যে, সাহাবা ও তাবেয়ীগণও এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তাঁহারা সর্বদাই রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস অনুসন্ধান করার কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং শুধু হাদীস না পাওয়ার ক্ষেত্রেই তাঁহারা বাধ্য হইয়া কিয়াস, ইসতিদলাল এবং প্রতিপাদনের আশ্রয় লইতেন এবং পরেও যদি তাঁহারা হাদীস প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইলে অবলীলাক্রমে স্বীয় কিয়াস পরিহার করিয়া উক্ত হাদীস গ্রহণ করিয়া লইতেন।

হযরত ইমামে আযম অথবা হযরত ইমাম মালিক যে কতকগুলি বিশুদ্ধ হাদীস শ্রবণ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই এবং খুব দায়ে ঠেকিয়াই যে তাঁহারা অনেকগুলি হাদীসের অনুসরণ করিতে পারেন নাই, কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সে কথা অস্বীকার করিবেন না। কারণ হযরত ইমাম শাফেয়ী হাদীসের যে বিরাট সম্ভার অধিকার করার সুযোগ পাইয়াছিলেন উল্লিখিত মহামতি ইমামদ্বয় তাঁহাদের জীবদ্দশায় সে সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। হানাফী মযহবের বিখ্যাত ফকীহ ও সাধক ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন ঃ

إنه لو عاش حتى دولت أحاديث الشريعة وبعد رحيل الحفاظ فى جمعها من البلاد والثغور وظفربها لأخذبها وترك كل قياس كان قياسه وكان القياس قل فى مذهبه كما قل فى مذهب غيره بالنسبة إليه لكن لما كان أدلة الشر يعة مفرقة فى عصره مع التابعين وتابع التابعين فى المدائن والقرى والثغور كثر القياس فى مذهبه بالنسبة إلى غيره من الائمة ضرورة لعدم وجود النص فى تلك المسائل التى قاس فيها -

যে সময় শরীঅতের হাদীস সমূহ সংকলিত হইয়াছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীস চয়ন করার উদ্দেশ্যে হাদীস তত্ত্ববিশারদগণ পৃথিবীর বিভিন্ন নগর নগরী ও সীমান্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইমাম আবু হানীফা যদি সে যুগে বাঁচিয়া থাকিতেন এবং ঐ সকল হাদীস তিনি শ্রবণ করার সুযোগ পাইতেন তাহা হইলে নিশ্চয় সেগুলি তিনি গ্রহণ করিতেন এবং সমুদয় কিয়াস পরিত্যাগ করিতেন এবং তাঁহার মযহবের তুলনায় অন্যান্য মযহবে যেরূপ কিয়াসের পরিমাণ কম ঘটিয়াছে তাঁহার মযহবেও সেইরূপ কিয়াসের স্বল্পতা পরিদৃষ্ট হইত। কিন্তু যেহেতু তাঁহার যুগে শরীঅতের দলীলগুলি তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের নিকট বিভিন্ন জনপদ ও ইলাকায় সুদূর প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহারই ফলে তাঁহার মযহবে অন্যান্য ইমামগণের তুলনায় কিয়াসের আধিক্য ঘটিয়াছিল। যে সকল মসআলায় স্পষ্ট নস বিদ্যমান ছিলনা সেই সকল মসআলার মীমাংসার জন্যই তাঁহার পক্ষে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়াছিল।

৪। সাহাবীগণের যে সকল উক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের প্রতিকূল, সেগুলিকে দলীলরূপে গ্রহণ না করা

ইমাম শাফেয়ীর সময়ে সাহাবীগণের ফতাওয়া ও উক্তিসমূহও সংকলিত হইয়াছিল। এই উক্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের বিরোধী পরিদৃষ্ট হইত।

কতকগুলি উক্তি সহীহ হাদীসেরও প্রতিকূল দেখিতে পাওয়া যাইত। ইমাম শাফেয়ী সহীহ হাদীসের মুকাবেলায় তাঁহাদের প্রতিকূল উক্তিসমূহ দলীলরূপে গ্রাহ্য করার রীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলিয়া দিয়াছিলেন। ঃ

هم رجال ونحن رجال

'সাহাবীগণও মানুষ ছিলেন আর আমরাও মানুষ।' সুতরাং আমাদের মত তাঁহাদের পক্ষেও ভুলভ্রান্তি সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর। অতএব সহীহ হাদীস প্রাপ্ত হইবার পর সাহাবীগণের ইজতিহাদের অনুসরণ করা আবশ্যক নয়। অধিকন্তু উহা বর্জন করা এবং হাদীস অবলম্বন করিয়া চলাই কর্তব্য।

৫। শরীঅত-বিরোধী অভিমত (রায়) আর শরীঅত অনুমোদিত কিয়াসের মধ্যে পার্থক্য করা।

ইমাম শাফেয়ীর যুগে কতক বিদ্বান স্বকীয় ইজতিহাদের ভিতর অবলীলাক্রমে স্বীয় রায় প্রয়োগ করিয়া চলিতেন এবং এই রায়কে শরীঅতের অন্যতম দলীল-কিয়াস মনে করিতেন। এবম্বিধ রায় তাঁহাদের পরিভাষায় ইসতিহসান নামে কথিত হইত। অথচ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যে যে শরীঅতসঙ্গত কিয়াস প্রচলিত ছিল তাহার তাৎপর্য ছিল কুরআন ও হাদীসের কোন প্রত্যক্ষ আদেশ নিষেধের কারণ আবিষ্কার করা এবং যে সকল বস্তু বা কার্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ নির্দেশ নাই সেগুলির মধ্যে উক্ত কারণ পরিদৃষ্ট হইলে সেই সকল কার্য বা বিষয় সম্বন্ধে উপরিউক্ত আদেশ বলবৎ করা। যেমন কুরআনে মদ্য হারাম হওয়া স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য মাদক দ্রব্যের কোন উল্লেখ নাই। এক্ষণে মদ্য হারাম হওয়ার আদেশ স্পষ্ট দলীলের ভিতর বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহা হারাম হওয়ার কারণ হইতেছে মাদকতা। অতএব এই মাদকতার কারণ যে সকল বস্তুর মধ্যে পাওয়া যাইবে সেগুলিকে হারাম বলিয়া নির্দেশিত করার কার্য শরীঅতসঙ্গত কিয়াস বলিয়া অভিহিত হইবে। এইরূপ কিয়াসই সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর নিজের কপোল-কল্পিত কথাকে হালাল বা হারাম হইবার কারণ রূপে গ্রহণ করার কার্য রায় নামে কথিত হইয়া থাকে। যথা ঃ ব্যাপক সুবিধা বা অসুবিধাকে কোন আদেশের কারণ রূপে গ্রহণ করা। ইমাম শাফেয়ী এই ধরণের কিয়াসকে যাহা আদৌ শরীঅতসঙ্গত কিয়াস নয় এবং যাহা বুদ্ধিজীবীদের কল্পনাবিলাস মাত্র, সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করিয়াছিলেন। আর তিনি খোলাখুলিভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন যে,

من استحسن فله أراد أن يكون شارعا

'যে ব্যক্তি ইসতিহসানের আশ্রয় গ্রহণ করিল সে পয়গম্বর সাজিবার ইচ্ছা করিল।'

ফল কথা, এই পাঁচটি বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী পূর্ববর্তীগণের পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনিই মধ্যবর্তী অবলম্বনগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া সরাসরিভাবে মূল উৎস হইতে ফিকহ শাস্ত্র নূতন ভাবে প্রণয়ন করেন এবং নির্দিষ্ট কোন দলের ফকীহ বা মুজতাহিদ অথবা নির্দিষ্ট কোন নগর নগরীর বিদ্বানগণের উক্তি এবং নীতির উপর ইজতিহাদের ভিত্তি স্থাপন না করিয়া সরাসরিভাবে কুরআন ও সুন্নাতের উপর স্বীয় মযহব প্রতিষ্ঠিত করেন। সমস্ত ঐতিহাসিক এবং পূর্ব ও পরবর্তী সমুদয় মুসলিম বিদ্বানের এ বিষয়ে দ্বিমত নাই যে, ইমাম শাফেয়ী সর্ব প্রথম ফিকহ্ শাস্ত্রের মূলনীতিগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনিই উহাকে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনিই সেগুলির ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ এবং শ্রেণীভেদ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনিই কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের সাহায্যে দলীল গ্রহণ করার নিয়ম ও শর্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনিই নাসিখ, মনসুখ, মুতলক, মুকাইয়াদ আম ও খাস প্রভৃতির আলোচনা সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, তিনিই দুর্বলতা ও বলিষ্ঠতার দিক দিয়া কিয়াস ও ইসতিদলালকে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

এরিষ্টোটল যেরূপ ন্যায় শাস্ত্রের আবিষ্কর্তা রূপে আর খলীল বিনে আহমদ যেরূপ কাব্য আবিষ্কার রূপে অমর হইয়া রহিয়াছেন, ইমাম শাফেয়ীও তদরূপ অসূলে ফিকহের আবিষ্কারকরূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার পূর্বে ফিকহ শাস্ত্রের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিলনা। আভিধানিক অর্থ ছাড়া ফিকহের কোন বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ছিলনা। যে বিদ্যাকে আজ আমরা ফিকহ নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক ও আবিষ্কার হইতেছেন ইমাম শাফেয়ী।

ইজতিহাদের যে সকল নীতি তিনি নির্ধারিত করিয়াছিলেন আমরা অতঃপর সেগুলিরও উল্লেখ করিব।

ইমাম শাফেয়ীর আলোচনায় এরূপ বিস্তৃত ভাবে মনঃসংযোগ করার দুইটি প্রধান কারণ। প্রথম, ইমাম শাফেয়ীই আহলে হাদীসগণের অন্যতম প্রধান ইমাম। দ্বিতীয়, ইমাম শাফেয়ী এবং তাঁহার মযহব সম্পর্কে আমাদের শিক্ষিত দলের অজ্ঞতা মারাত্মক ভাবে সীমাবদ্ধ। এই প্রবন্ধের ভিতর দিয়া যদি আমি ইমাম শাফেয়ীকে আমাদের দেশের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিচিত করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

(ক) ইমাম শাফেয়ীর ইজতিহাদের প্রথম বুনয়াদী নীতি (Basic principle) এই যে, দীনের মূল হইতেছে কুরআন ও হাদীস আর উহাদের অবিদ্যমানতায় কুরআন ও হাদীসের অনুকূল কিয়াস।

(খ) যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত সংলগ্নভাবে প্রমাণিত এবং যাহার সনদের ভিতর কোনরূপ ত্রুটি নাই তাহা সুন্নাত।

(গ) এককভাবে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা ইজমার আসন উর্ধতর।

(ঘ) সকল সময় হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বিভিন্ন অর্থবোধক হাদীস সমূহের মধ্যে উহার যে অর্থ প্রকাশ্য হাদীসের অনুরূপ সেই হাদীসকেই অগ্রগণ্য করিতে হইবে।

(ঙ) সমান শ্রেণীর বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলে যে হাদীসের সনদ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহাই অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(চ) বিখ্যাত তাবেঈ সঈদ বিনুল মুসাইয়ের ছাড়া অন্য কোন বর্ণনাদাতার মুর্সল হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

(ছ) একটি মৌলিক আদেশকে অপর কোন মৌলিক আদেশের সঙ্গে কিয়াস করা চলিবে না। শরীঅতের মূলনীতির ভিতর একথা বলা চলিবেনা যে, এই আদেশের কারণ কি এবং কি ভাবে এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। একথা বিস্তৃত আদেশ নিষেধের (ফরূআৎ) বেলাতেই বলা চলিতে পারিবে। ফরূআতের কিয়াস যদি মৌলিক আদেশের সহিত সুসমঞ্জস হয় তবেই সে ইজতিহাদ সঠিক এবং উহা দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(জ) যে নির্দিষ্ট কারণে আদেশ অবতীর্ণ, হইয়াছে সে কারণটি কোন ক্রমেই আদেশের আওতার বহির্ভূত বিবেচিত হইবে না। আদেশের শব্দের ব্যাপক অর্থ অনুসারে অবতীর্ণ কারণ সমূহের উপর উক্ত আদেশ প্রযোজ্য হইলেও মূলতঃ যে কারণে আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাকে কোন অবস্থাতেই উল্লিখিত নির্দেশের বহির্ভূত গণ্য করা চলিবে না।

শেষোক্ত নিয়মটি অনুসরণ না করার ফলে বিদ্বানগণের মধ্যে বহু গোলযোগ ঘটিয়া গিয়াছে। আমরা এস্থলে মাত্র দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইব।

সূরা আল-বাকারার বিখ্যাত আয়ত ঃ

وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

"এবং তোমরা আল্লাহর তকবীর ধ্বনি কর, যে ভাবে তিনি তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন"- রামাযানের সিয়াম প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী এই আয়াত অনুসারে ঈদুল ফিতরের তকবীর সমূহেকে ওয়াজিব বলিয়া থাকেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, ঈদুল ফিতর সম্পর্কে এই আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার দরুণ ঈদুল ফিতরের তকবীর এই আদেশের বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে

না এবং আদেশের শব্দের ব্যাপক অর্থ অনুসারে ঈদুল আযহার তকবীর উহার অন্তর্ভুক্ত রূপে বিবেচিত হইবে। পক্ষান্তরে তকবীরের আদেশ শুধু ইদুল ফিতর উপলক্ষে অবতীর্ণ হইলেও ইমামে আযম আবু হানীফা ঈদুল ফিতরের তকবীরগুলিকে মকরূহ বলিয়াছেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে, "হে আল্লাহর রাসূল (সা) যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর শয্যায় অপর কোন পুরুষকে দেখিতে পায় তাহা হইলে সে কি তাহাকে হত্যা করিবে এবং আপনি অতঃপর খুনের দায়ে তাহাকেও হত্যা করিবেন? না, সে কি করিবে?' এ সম্পর্কে কুরআনে 'লি'আনের' আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত ব্যক্তিকে বলেন যে, তোমার এবং তোমার স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ বিচার করিয়া দিয়াছেন। হাদীসের রাবী সহল বিনে সঅদ বলিতেছেন যে, অতঃপর স্বামী স্ত্রী উভয়েই 'লিআন' করিল এবং আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থাকিয়া উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) 'লি'আনের' পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়া দেন এবং এই ভাবে 'লিআনে'র পর বিচ্ছেদের রীতি সুন্নত হইয়া দাঁড়ায়। স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী ছিল, কিন্তু তাহার স্বামী উক্ত সন্তানকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং উক্ত সন্তান তাহার জননীর নামে পরিচিত হইয়াছিল। অতঃপর এইরীতি প্রবর্তিত হয় যে, এরূপ সন্তান মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে এবং জননীও আল্লাহর নির্দেশিত ব্যবস্থামত সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হইবে।

এই হাদীস সূত্রে ইমাম শাফেয়ী তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদিও বিনাগর্ভে স্ত্রীর সহিত 'লি'আন চলিতে পারে কিন্তু যেহেতু 'লি'আনের' অনুমতির আয়াতটি গর্ভবতী নারী সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছিল, অতএব গর্ভবতী নারীর সঙ্গেও 'লি'আন করা বৈধ হইবে। পক্ষান্তরে শানে নযূলকে আদেশের অন্ত-র্ভুক্ত গণ্য না করায় ইমাম আবু হানীফা গর্ভবর্তী নারীর সহিত 'লিআন' করাকে অবৈধ বলিয়াছেন।

ইমাম শাফেয়ী এই মৌলিক নীতিও স্বিরীকৃত করেন যে, কুরআনের যে সকল পাঠ-পদ্ধতি বিরল এবং সুপ্রসিদ্ধ ও সার্বজনীন পাঠ-পদ্ধতির বিরোধী, তাহা অনুসরণীয় হইবে না। এই নীতির অনুসরণ করিয়া কাফফারার কসম সম্বন্ধে তিনি উপর্যুপরি তিনটি রোযা রাখা প্রয়োজন মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রসিদ্ধ কিরআতে উপর্যুপরি সিয়ামের উল্লেখ করা হয় নাই। শুধু তিনটি রোযার আদেশ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন

যে, আবদুল্লাহ বিনে মাসউদের বিরল কিরআতে 'উপর্যুপরি' শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে ঃ

فصيام ثلاثة أيام متتابعات

অতএব শপথের কাফফারায় তিনটি রোযাই উপর্যুপরি ভাবে পালন করিতে হইবে।

(ঝ) ইমাম শাফেয়ী বলেন, কোন আদেশ নির্দিষ্ট অবস্থার শর্তাধীনে প্রদত্ত হইয়া থাকিলে সেই শর্ত বা অবস্থার অবিদ্যমানতায় উক্ত আদেশ প্রযোজ্য রহিবেনা আর ইমাম আবু হানীফা বলেন যে, শর্ত বা অবস্থার অবলুপ্তির দ্বারা মূল আদেশ রহিত হইবে না! দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআনে কথিত হইয়াছে যে,

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات -

'তোমাদের মধ্যে যাহাদের স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিবাহ করার ক্ষমতা নাই তাহারা মুসলিম দাসীকে বিবাহ করিবে।" এই আয়াত সূত্রে ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির স্বাধীন নারীকে বিবাহ করার ক্ষমতা রহিয়াছে তাহার পক্ষে দাসীকে বিবাহ করা বিধেয় হইবে না। কারণ দাসীকে বিবাহ করার অনুমতি এই শর্তে আবদ্ধ রহিয়াছে যে, সে ব্যক্তির স্বাধীন নারী গ্রহণ করার ক্ষমতা নাই। পুনশ্চ এই আয়াত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী অমুসলিম দাসীকে বিবাহ করাও অসিদ্ধ বলিয়াছেন। কারণ দাসীকে আয়াতের ভিতর বিবাহ করার অনুমতি ঈমানের শর্তাধীন রাখা হইয়াছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাসী বিবাহ করার অনুমতি দিয়াছেন এবং দাসীর জন্য মুসলমান হওয়ার শর্ত অবশ্য প্রতিপালনীয় বলেন নাই।

(ঞ) ইমাম শাফেয়ী মৌন ইজমার (اجماع سكوتى) প্রামাণিকতা স্বীকার করেন নাই।[৭] কারণ একজন সাহাবীর কোন কার্যকে অপর সাহাবী ভয়ের বশবর্তী হইয়া অবৈধ জানা সত্ত্বেও উহার প্রতিবাদে বিরত থাকিতে পারেন। সুতরাং সাহাবীগণের মৌনভাব এবং কোন কার্যের প্রতিবাদে তাঁহাদের বিরত থাকা তাঁহাদের সম্মতির প্রমাণ হইতে পারেনা। হাদীসের পাঠকবর্গের ইহা অবিদিত নাই যে, কতিপয় সাহাবা বিভিন্ন কারণে অনেকগুলি ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করেন নাই।

[৭] যে মসআলা সম্বন্ধে পৃথিবীর সমুদয় মুজতাহিদের স্পষ্টভাবে একমত হওয়ার কথা জানা নাই, অথবা বিমতেরও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই মোটামুটি ভাবে তাহাকে মৌন ইজমা বলা হয়। - লেখক

(ট) মুতলক আদেশকে সীমাবদ্ধ আদেশরূপে ধরিয়া লওয়া। যথা, সাদাকাতুল ফিতর সম্বন্ধে দুই প্রকার নস বিদ্যমান রহিয়াছে। একটিতে বলা হইয়াছে,

ادوا عن كل حر و عبد

প্রত্যেক স্বাধীন ও দাসের পক্ষ হইতে ফিতরা আদা' করা। এই আদেশটি সাধারণ। কিন্তু দ্বিতীয় আদেশে বলা হইয়াছে,

أدوا عن كل حرو عبد من المسلمين

প্রত্যেক স্বাধীন ও দাস মুসলিমের তরফ হইতে ফিতরা আদা' করা, এই আদেশটি সীমাবদ্ধ। কারণ ইহা দ্বারা শুধু মুসলমানগণই ফিতরা দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, প্রথম সাধারণ আদেশটিকে দ্বিতীয় আদেশ সূত্রে সীমাবদ্ধ রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রথম হাদীসে কথিত স্বাধীন ও দাসের অর্থ স্বাধীন ও দাস মুসলিম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব কাফের দাসের জন্য ফিতরা ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন যে, ফিতরার জন্য ইসলামের কোন শর্ত নাই। সুতরাং বিধর্মী দাসের জন্যও ফিতরা পরিশোধ করা ওয়াজিব।

(ঠ) ইমাম শাফেয়ী বলেন, সাধারণ আদেশ সকল অবস্থায় এবং সকল ক্ষেত্রে অকাট্য ভাবে সাধারণত্বের পর্যায়ভুক্ত থাকিতে পারে না। এমন কোন সাধারণত্বই নাই যাহার মধ্যে কোন ব্যতিক্রমই নাই। এই মূলনীতির ফলে ইমাম শাফেয়ীর কাছে শাকপাতা প্রভৃতি তরকারীর উশর ওয়াজিব নয়। যদিও হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে,

ما اخرجت الارض ففيه عشر

"মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন সকল বস্তুর জন্যই উশর আছে।" কিন্তু অন্যতম হাদীস ليس فى الخضروات صدقة 'শাক সব্জীর উপর উশর নাই', প্রথমোক্ত–হাদীসের ব্যাপকতা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা এক সের পরিমাণ তরিতরকারীতেও উশর ওয়াজিব করিয়াছেন।

এই সকল মৌলিক নীতি ছাড়াও ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম শাফেয়ী একটি বিশেষ কথা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি কিয়াসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

(ক) যদি উপপাদ্য বিষয়টি মূল আদেশ অপেক্ষা যোগ্যতর হয় তাহা হইলে আদেশের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে না। পরন্তু মূল আদেশটি উপপাদ্য সমাধানের জন্য অবলীলাক্রমে ব্যবহৃত হইবে। যথা, দাসীদের সম্বন্ধে মূল আদেশ এই যে,

فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ

তাহারা ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে স্বাধীন নারীর অর্ধেক দন্ড ভোগ করিবে। আয়াতে শুধু দাসীদের দণ্ডবিধি উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কুরআনের কুত্রাপিও এসম্পর্কে দাসদের দন্ডের কথা উল্লিখিত হয় নাই। ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, সাধারণ জ্ঞান অনুসারে দাসীগণ অপেক্ষা দাসদের উপর দণ্ড তাহাদের সামর্থের আধিক্য অনুসারে– প্রযুক্ত হওয়া উচিত। সুতরাং দাসগণও উল্লিখিত আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়টি যদি মূল আদেশ অপেক্ষা স্পষ্টতর না হয়, তাহা হইলে দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে একটি দ্বারা উহার সমাধান করিতে হইবে। প্রথমত ঃ মূল আদেশের কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে এবং প্রতিপাদ্যের ভিতর উক্ত কারণ বিদ্যমান থাকিলে তাহার জন্যও মূল আদেশ বলবৎ করা হইবে। যথা, কুরআনে মদ্য হারাম হওয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু অপরাপর মাদক দ্রব্যের কথা কথিত হয় নাই। অথচ মদের নিষিদ্ধতার কারণ হইতেছে উহার মাদকতা। সুতরাং মদের মাদকতা যেকোন বস্তুর ভিতর পাওয়া যাইবে তাহাও হারাম বলিয়া অবধারিত হইবে। ইমাম শাফেয়ী এইরূপ কিয়াসকে কিয়াসুল মা'না (قياس المعنى) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

(গ) দুই প্রকার উল্লিখিত আদেশের মাঝখানে যদি এমন একটি তৃতীয় প্রকারের অবস্থা সৃষ্টি হয় যাহার আদেশ স্পষ্টতঃ জানা নাই– এরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থাটিকে উল্লিখিত উভয়বিধ অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে এবং তন্মধ্যে যে অবস্থার সহিত উহার সৌসাদৃশ্য অধিকতর এবং প্রকটতর দেখা যাইবে উপপাদ্য বিষয়টি সম্বন্ধে সেই আদেশই প্রয়োজ্য হইবে। যথা, তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত বা সংকল্প অন্যতম শর্ত কিন্তু বস্ত্রের পবিত্রতার এই দুই প্রকার আদেশের মধ্যভাগে ওযূর স্থান। কিন্তু বস্ত্রের পবিত্রতা অপেক্ষা তায়াম্মুমের সঙ্গেই ওযূর সৌসাদৃশ্য অধিকতর এবং প্রকটতর। কারণ ওযূ এবং তায়াম্মুম একই উদ্দেশ্য অর্থাৎ নামাযের শুদ্ধতার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু বস্ত্রের বিশুদ্ধতার ব্যাপার এরূপ নয়। অধিকন্তু যে সকল কারণে ওযূ নষ্ট হইয়া যায় তায়াম্মুম ভঙ্গকারী কারণগুলিও তাহাই, সুতরাং বস্ত্রের পবিত্রতা অপেক্ষা ওযূকে তায়াম্মুমের পর্যায়ভুক্ত করা অধিকতর বিধেয়। ইমাম শাফেয়ী এইরূপ কিয়াসকে 'কিয়াসে শুবাহ' (قياس الشبه) নাম দিয়াছেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানীফা তাঁহার সমস্ত জীবন কিয়াসের প্রামাণিকতায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপক্ষের দল সকল সময় তাঁহার বিরুদ্ধে হাদীসের অন্যথাচরণ এবং কিয়াস অনুসরণের অভিযোগ আরোপ করিতেন। ইমাম জাফর সাদিক তাঁহার

কাছে কিয়াস বাতিল হওয়ার অনেকগুলি দলীল উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, ইমাম আবু হানীফা এই সকল অভিযোগের কখনও উত্তর প্রদান করেন নাই এবং কিয়াসের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন দলীল দেওয়াও আবশ্যক মনে করেন নাই। এই বিদ্যার একটি পৃষ্ঠাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ীই সর্বপ্রথম কিয়াসের প্রামাণিকতা প্রকাশ করেন এবং এই শাস্ত্রে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া বিদ্বানদিগকে উপকৃত করেন। অথচ তাঁহার স্বভাবে হাদীসের অনুসরণ-রীতিই অধিকতর প্রবল ছিল। যে গভীর গবেষণা ও অধ্যবসায়-শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইমামুল আয়েম্মাহ শাফেয়ী স্বকীয় মযহবের নীতি ও নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এই একটি ঘটনা দ্বারাই তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, ইজমার প্রামাণিকতার দলীল অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিন শতবার কুরআন পাঠ করিয়াছিলাম এবং সর্বশেষে একটি আয়াত দ্বারাই আমি সকল সন্দেহের অবসান ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

ইমাম শাফেয়ীর ইজতিহাদ

যে সেকল মসআলায় হানাফী মযহবের সহিত ইমাম শাফেয়ী বিরোধ করিয়াছেন , শিক্ষিত সমাজের অবগতির জন্য আমরা সেগুলির কতকাংশ নিম্নে সংকলিত করিয়া দিতেছি।

১। ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওযুর জন্য সংকল্প (নিয়ৎ) করা ওযুর বিশুদ্ধতার অন্যতম শর্ত, ইমাম আবু হানীফার নিকট নয়।

২। ইমাম শাফেয়ীর নিকট পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ তরতীব রক্ষা করিয়া ওযু করা ফরয । হানাফী মযহবে ফরয নয়।

৩। ইমাম শাফেয়ীর নিকট মাথা মসহ করার নির্ধারিত কোন পরিমান নাই। ইমাম আবু হানীফার নিকট এক চতুর্থ মস্তক মসহ করা ফরয।

৪। ইমাম শাফেয়ীর নিকট সমুদয় নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম। ইমাম আবু হানীফার নিকট মাগরিব ব্যতীত সমুদয় নামায বিলম্ব করিয়া পড়াই উত্তম ।

৫। যে সকল নামাযে কিরআত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে হয় ইমাম শাফেয়ীর নিকট সেই সকল নামাযে ' বিসমিল্লাহ'ও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা আবশ্যক, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট মকরূহ ।

৬। ইমাম শাফেয়ীর নিকট উচ্চ ও নিম্নস্বরের সকল নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক, ইমাম আবু হানীফার নিকট নয়।

৭। ইমাম শাফেয়ীর নিকট রুকু ও কওমার সময় রফউল ইয়াদায়েন করা সুন্নত, ইমাম আবু হানীফার নিকট নয়।

৮। নামাযের প্রাক্কালে ইকামতের বাক্যগুলি 'কাদকামাতিস সালাত' ছাড়া আর সমস্তই ইমাম শাফেয়ীর নিকট একবার করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন যে , ইকামত আযানেরই মত।

৯। ইমাম শাফেয়ীর নিকট গৃহপালিত পশুর যাকাতের বিনিময়ে উহার মূল্য প্রদান করা জায়েয নয় , কিন্তু ইমাম আবু হানীফা উহা জায়েয বলিয়াছেন ।

১০। ইমাম শাফেয়ীর নিকট যে স্ত্রীকে পুরুষ তাহার মৃত্যুশয্যায় তালাক প্রদান করিয়াছে সে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হইবে না, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট অবশ্যই হইবে।

১১। ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওযু বা গোসলের ব্যবহৃত পানি না-পাক নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট না-পাক।

১২। ইমাম শাফেয়ীর নিকট ব্যভিচারের ফলে মুসাহরতের হুরমত সাব্যস্ত হয়না- অর্থাৎ যে নারীর সহিত পুরুষ ব্যভিচার করিয়াছে তাহার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ সন্তানের সহিত উক্ত পুরুষের ঔরস-জাত বৈধ সন্তানের বিবাহ সিদ্ধ হইবে; কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ইহাকে হারাম বলিয়াছেন, এমন কি সকাম অবস্থায় কোন নারীর দেহ স্পর্শ করিলে অথবা তাহার প্রতি সকাম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও উক্ত নারীর জননী ও কন্যাগণ উক্ত পুরুষের পক্ষে চিরদিনের জন্য হারাম হইয়া যইবে এবং উক্ত পুরুষের জননী ও ভগ্নিরাও উল্লিখিত নারীর স্বামী এবং পুত্রগণের পক্ষে অনন্তকালের জন্য হারাম হইয়া যাইবে।

১৩। ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওলী ব্যতীত নারীর বিবাহ সিদ্ধ নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা প্রাপ্তবয়স্ক নারীর পক্ষে ওলীর অনুমতি গ্রহণ করাও আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

১৪। অট্টহাস্য করিলে ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওযু নষ্ট হয়না , কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট নামাযে অট্টহাস্য করিলে ওযু নষ্ট হইয়া যাইবে।

১৫। দেহ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে অথবা বমন করিলে ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওযু নষ্ট হয়না, কিন্তু ইমাম আ'যমের নিকট নষ্ট হইয়া যায়।

১৬। খেজুরের রসে ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওযু জায়েয নয়, তাঁহার মযহবে পানির অভাবে তায়াম্মুম করিতে হইবে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট খেজুরের রস মওজুদ রহিলে তায়াম্মুম জায়েয হইবে না, খেজুরের রস দিয়াই ওযু করিতে হইবে।

১৭। ওযুর মধ্যে কুল্লির সময়ে হঠাৎ ভুল করিয়া যদি পানি গলার নিচে চলিয়া যায় তাহা হইলে ইমাম শাফেয়ীর নিকট রোযা নষ্ট হইবেনা, কিন্তু ইমামে আ'যমের নিকট রোযা নষ্ট হইবে।

১৮। মুসলমান প্রভুর পক্ষে কাফের গোলামের ফিতরা ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওয়াজিব নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা উহা ওয়াজিব বলিয়াছেন।

১৯। নফল রোযার কাযা ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওয়াজিব নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রোযা কাযা করিতে বলিয়াছেন।

২০। ইমাম শাফেয়ীর নিকট কুড়ি মণের কম উৎপন্ন হইলেও উশর ওয়াজিব হইবে।

২১। ইমাম শাফেয়ীর নিকট ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত নাই, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট ব্যবহৃত অলঙ্কারেও যাকাত ওয়াজিব।

২২। ইমাম শাফেয়ীর নিকট সকল স্থানেই জুমুআর নামায দুরস্ত হইবে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট শহর ছাড়া ও শাসনকর্তার উপস্থিতি ব্যতিরেকে জুমুআ' দুরস্ত হইবেনা।

২৩। ঈদের দিনে রোযার নযর মান্য করা ইমাম শাফেয়ীর নিকট জায়েয নয়, কিন্তু ইমামে আ'যমের নিকট উহা জায়েয।

২৪ বলপূর্বক কেহ যদি কাহারও নিকট হইতে তাহার স্ত্রীর তালাক আদায় করিয়া লয় আর সে প্রাণের ভয়ে যদি তালাক দিয়া বসে তাহা হইলে সে তালাক ইমাম শাফেয়ীর নিকট সংঘটিত হইবেনা, কিন্তু ইমামে আ'যমের নিকট প্রাণের ভয়ে তালাক দিলেও উহা সংঘটিত হইবে।

২৫। নিয়ত ছাড়াই শুধু মৌখিক তালাক শব্দ উচ্চারণ করিলে ইমাম শাফেয়ীর নিকট তালাক ঘটিবেনা, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট নিয়ত না থাকিলেও তালাক ঘটিয়া যাইবে।

২৬। ইমাম শাফেয়ীর নিকট মুসলমান গোলাম কাফেরের প্রতিভু হইতে পারিবে, কিন্তু মুসলমান গোলামের এ অধিকার ইমামে আযম স্বীকার করেন নাই, বরং প্রভুকে চুক্তি ভঙ্গ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

২৭। কোন ব্যক্তি জনৈকা নারীকে বিবাহ করিল এবং নারীর অঙ্গ স্পর্শ করার পূর্বেই বিবাহ মজলিসের ভিতর কাযী এবং সাক্ষীদের সম্মুখে উক্ত স্ত্রীলোককে তালাক প্রদান করিল কিন্তু এই ঘটনার ছয় মাস পর উক্ত নারী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল। ইমাম শাফেয়ী বলেন, উক্ত সন্তানকে উল্লিখিত পুরুষের বংশধর বলিয়া গ্রাহ্য করা হইবেনা। কিন্তু ইমামে আযম বলেন যে, উক্ত সন্তানকে উল্লিখিত পুরুষের পুত্ররূপে গ্রাহ্য করিতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা অথবা ইমাম শাফেয়ীর সমুদয় মসআলাই যে সঠিক অথবা ভ্রান্তিপূর্ণ ইহা প্রমাণিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উক্ত ইমামের ইজতিহাদের স্বরূপ বিচার করিয়া দেখার জন্যই আমরা বিদ্বান ও বুদ্ধিমানগণের সম্মুখে বহি পুস্তক ঘাটিয়া উল্লিখিত বৈষম্যগুলি উপস্থাপিত করিলাম। উত্তরকালে শাফেয়ী মযহবের যে সকল মসআলা হানাফীগণের মধ্যেও চালু হইয়া গিয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা অতঃপর পেশ করিতেছি।

(১) নিয়ত ও তরতীব ছাড়া ওযু সিদ্ধ না হওয়ার অভিমত হানাফী শাফেয়ী সকলেই মানিয়া লইয়াছেন।

(২) খেজুরের রসে ওযু সিদ্ধ না হওয়ার সিদ্ধান্তও সকলে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

(৩) যবহ্ করা বা না-করা কুকুরের চামড়া সকল অবস্থায় অপবিত্র হওয়ার অভিমতও সকলেই মানিয়া লইয়াছেন।

(৪) সূরা আল-ফাতিহা ব্যতীত নামায অসিদ্ধ হওয়ার উক্তিও সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ।

(৫) সমস্ত রাকআতেই কিছু না কিছু কুরআন পাঠ করার উক্তিও সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন।

(৬) প্রথম দুই রাকআতের পর তাশাহুদ পাঠ করার অপরিহার্যতাও সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

(৭) প্রবাসী ও রোগীর জন্য যোহর ও আসর অথবা মাগরিব ও এশার নামায জমা করিয়া পড়ার অনুমতি সকলেই দিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য রোযা কাযা করার অনুমতিও সর্বস্বীকৃত হইয়াছে।

(৮) দরূদ শরীফ পাঠ না করিলে যে নামায সিদ্ধ হয়না ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমত হানাফী ও শাফেয়ী সকলেই মানিয়া লইয়াছেন।

(৯) বস্ত্রে টাকার পরিমান স্থানে মলমূত্র প্রভৃতি না-পাকি লাগিয়া থাকিলে যে নামায সিদ্ধ হইবে না , ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমত হানাফীগণও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ।

(১০) রুকু ও সিজদায় কিছুটা বিলম্ব করা যে অত্যাবশ্যক একথাও উভয় পক্ষই মানিয়া লইয়াছেন।

(১১) ফারসী অথবা উরদু, বাংলা কিংবা অন্য কোন ভাষায় কুরআনের তরজমা পাঠ করিলে নামায যে সিদ্ধ হইবেনা পরন্তু নামাযের বিশুদ্ধতার জন্য মূল আরাবী কুরআনই পাঠ করিতে হইবে, ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমতও হানাফী বিদ্বানগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

(১২) ' হিবা ' বা দান শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হইবেনা, বিবাহের জন্য সুস্পষ্টভাবে 'বিবাহ' শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে- একথাও উভয় পক্ষ স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

ইমাম শাফেয়ী সম্বন্ধে বিদ্বানগণের সাক্ষ্য

জগতবরেণ্য ইমাম মালিক বিনে আনস (রহ) বলেন যে, শাফেয়ী অপেক্ষা অধিকতর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন কুরায়শী আমার নিকট কোন দিন আগমন করেন নাই।[8]

ইমাম আবু হানীফার শ্রেষ্ঠ ছাত্র হানাফী মযহবের সংকলয়িতা ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসান (১৩১-১৭৯) বলেন যে,

إن تكلم أصحاب الحديث يوما، فبلسان الشافعى -

আহলে হাদীসগণ যদি কোন দিন কথা বলেন, তাহা হইলে শাফেয়ীর ভাষাতেই বলিবেন।[9]

আহলে সুন্নাতগণের অপ্রতিদ্বন্দী ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল্ (১৬৪-২৪০) বলেন যে,

ما أحد من أهل الحديث مس محبرة ولا قلما، إلا وللشافعى فى رقبته منه -

পৃথিবীতে এমন কোন বিদ্বান নাই, যিনি দোয়াত-কলম স্পর্শ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার স্কন্ধে শাফেয়ীর অনুগ্রহ নাই।[10]

ইমাম হাসান বিনে মুহাম্মদ বিনে সাব্বাহ যাফরাণী (-২৬৯) বলেন,

كان أصحاب الحديث رقودا حتى أيقظهم الشافعى -

আহলে হাদীসগণ সকলেই ঘুমন্ত ছিলেন, শাফেয়ী আসিয়া তাঁহাদিগকে জাগরিত করিলেন।[11]

ইমাম ইউনুস বিনে আবদুল আ'লা ইবনে ময়সরা সদফী (১৭০-২৬৪) বলেন যে, পৃথিবীর সমুদয় অধিবাসীর অর্ধেক বুদ্ধি যদি ইমাম শাফেয়ীর বুদ্ধির সহিত ওজন করা হয়, তাহা হইলে শাফেয়ীর বুদ্ধি ওজন বাড়িয়া যাইবে।[12]

ইমাম আবু সওর ইবরাহীম বিনে খালীদ বাগদাদী (২৪০ হিঃ) বলেন যে, শাফেয়ী সুফয়ান সওরী ও ইবরাহীম নখয়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফকীহ ছিলেন।[13]

[8] । মুখ্তসর মু'মল, ৪ ও ৫ পৃঃ।
[9] তওয়ালীউত্তাসীস-ইবনে হজর, ৫৮-৫৯ পৃঃ।
[10] তওয়ালীউত্তাসীস-ইবনে হজর, ৫৮-৫৯ পৃঃ
[11] তওয়ালীউত্তাসীস- ইবনে হজর, ৫৮-৫৯ পৃঃ।
[12] তাওয়ালীউত্তাসীস-ইবনে হজর, ৫৮-৫৯।

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ইহাও বলিয়াছেন যে,

ماعرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعى -

শাফেয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পূর্বে আমি নাসিখ ও মুনসুখ হাদীস চিনিতাম না।[13] তিনি আরও বলিয়াছেন যে,

الشافعى كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن -

দুনিয়ার পক্ষে সূর্য আর দেহের পক্ষে সুস্থ্যতা যেরূপ, বিদ্বানগণের জন্য শাফেয়ীও তদ্রূপ।[14].

ইমাম হিলাল বিনুল উলা বিনে হিলাল আল-বাহেলী (-২৮০) বলেন যে,

أصحاب الحديث عيال على الشافعى فتح لهم الاقفال -

আহলে হাদীসরা সকলেই- ইমাম শাফেয়ীর পরিবারভুক্ত। তিনি তাঁহাদের জন্য অবরুদ্ধ তালা খুলিয়াছেন।[15]

ইমাম আবদুর রহমান আবু শামা (৫৯৬-৬৬৫) স্বীয় মু'মল গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে সকল মুজতাহিদ ইজতিহাদের বিদ্যা পৃথিবীর সকল প্রান্তে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা কুরআনের বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী ছিলেন, কাহারও জ্ঞান সুন্নাতের বিদ্যায় প্রখরতর ছিল, কেহ বা আরবী সাহিত্যে অধিকতর দক্ষতা রাখিতেন আর কেহ মস্আলা আবিষ্কারের কার্যে কুশাগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত বিদ্যাগুলিতে তুল্যভাবে কোন ইমামেরই অধিকার ছিল না - একমাত্র ইমাম শাফেয়ী ব্যতীত, এই সকল বিদ্যায় তিনিই সর্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত এবং গভীরতম জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।[16]

ইমামুল আয়েম্মা আবু সুলায়মান দাউদ বিনে আলী আয্যাহেরী (২০১-২৭০) বলিয়াছেন, ইনি সেই শাফেয়ী মুত্তালবী-- যিনি সূচাগ্র প্রতিভা দ্বারা মানব সমাজকে গৌরবান্বিত এবং স্বীয় বলিষ্ঠ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বিদ্বজ্জনমণ্ডলীকে পরাভূত এবং স্বীয় শৌর্য দ্বারা পরাস্ত আর ধর্মপরায়ণতা এবং সাধুতা ও বংশমর্যাদা দ্বারা তাঁহাদের উপর জয়যুক্ত হইয়াছেন। স্বীয় প্রভুর গ্রন্থের ধারক এবং রাসূলের (সা) সুন্নাতের অনুসারী, বিদআতীগণের নেতৃবৃন্দের নিশ্চিহ্নকারী, তাহাদের আচরণে কালিমাসিক্তকারী এবং কুরআনে কথিত-

فاصبح هشيما تذروه الرياح -

[13] ঐ
[13] ইবনে খল্লকান, [১] ৪৪৭ পৃঃ।
[14] ঐ
[15] মুমল, ৪-৫ পৃঃ।
[16] মুমল, ৪-৫ পৃঃ।

'বাত্যাবিক্ষুব্ধ উদ্ভিদ পত্রের ন্যায় তাহাদের চূর্ণ বিচূর্ণকারী।'[১৭]

ইমাম শাফেয়ী লিখিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর সহিত তর্কযুদ্ধে ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসানের পরাজয়ের কথা খলীফা হারুনুর রশীদ শুনিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন যে, মুহাম্মদ বিনুল হাসান যতই বিদ্বান হউন না কেন (এই) কুরায়শী পুরুষের সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলে তিনি মুহাম্মদ বিনুল হাসানকে অবশ্যই পরাভূত করিবেন। পুনশ্চ যখন খলীফা শুনিতে পাইলেন যে, তিনি ইমাম শাফেয়ীকে যে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন শাফেয়ী তাঁহার সমস্তই দীন দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন, খলীফা তখন বলিলেন, মুত্তালিবের বংশধরগণ আভিজাত্য ও দানশীলতায় রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবারবর্গ অপেক্ষা কোন অংশেই ভিন্ন নয়।[১৮]

বিখ্যাত সাধক ইমাম আবুল হাসান শাযলী মালেকীকে শায়খ শাহাবুদ্দীন ইবনুল মালীক শাফেয়ী বলিলেন যে, আমি আপনার সাহচর্য করিতে চাই কিন্তু আমার শর্ত এই যে, আমি শাফেয়ী মযহব পরিত্যাগ করিতে পারিব না। শাযলী বলিলেন, -বহুত আচ্ছা! আপনি উক্ত মযহবে আরো দৃঢ় হউন, কারণ ইমাম শাফেয়ী কুতুব না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই।[১৯]

স্বনামধন্য অর্থনীতিবিশারদ ইমাম আবু উবায়দ কাসিম বিনে সালাম বাগদাদী (১৫৭-২২৪) বলেন যে আমি শাফেয়ী অপেক্ষা কামিল পুরুষ আর কাহাকেও দর্শন করি নাই। পুনশ্চ বলেন যে, আমি কখনও কোন ব্যক্তিকে শাফেয়ীর ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন পরহেযগার, প্রাঞ্জলভাষী এবং সাহসী পুরুষ দর্শন করি নাই।[২০]

রিজাল ও হাদীস শাস্ত্রের জগদ্বরেণ্য ইমাম ইয়াহ্‌য়া বিনে মঈন (১৫৮-২৩৩) একদা দেখিতে পাইলেন যে, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ইমাম শাফেয়ীর খচ্চরের পিছনে পিছনে পদব্রজে ইমামকে অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। ইবনে মঈন ইমাম আহমদকে বলিলেন, আপনার একি অবস্থা? ইমাম আহমদ বলিলেন, চুপ করিয়া থাক।

যদি তুমি এই খচ্চরের অনুসরণ করিয়া চলিতে পার তাহা হইলে অনেক উপকৃত হইবে।[২১]

[17] ইয়াফেয়ী ঃ মিরআতুল জেনান, [২] ১৪ পৃঃ।
[18] ইয়াফেয়ী ঃ মিরআতুল জেনান, ১৫ পৃঃ।
[19] ইয়াফেয়ী ঃ মিরআতুল জেনান, [২] ১৬ পৃঃ।
[20] ইয়াফেয়ী ঃ মিরআতুল জেনান, [২] ১৭ পৃঃ।
[21] ইয়াফেয়ী ঃ মিরআতুল জেনান, [২] ১৭ পৃঃ।

হাদীস শাস্ত্র বিশারদগণের ইমাম, ইমাম শাফেয়ীর অন্যতম উসতায আবদুর রহমান বিনে মহদী (১৩৫-১৯৮) ইমাম শাফেয়ী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, পৃথিবীতে এই ব্যক্তির তুলনা নাই- [তহযীবুত্ তহ্‌যীব, (৬) ২৭৯ পৃঃ]

ইমাম শাফেয়ী কর্তৃক বিরচিত কিতাবুর্ রিসালা পাঠ করিয়া ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলিয়াছেন যে, আল্লাহ শাফেয়ীর মত কোন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছেন- আমার এরূপ ধারণা নাই।[২২]

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল আরো বলিয়াছেন যে, শাফেয়ী চারিটি বিষয়ে ডক্টর (فيلسوف) হইয়াছেন ঃ ১। অভিধান শাস্ত্রে, ২। বিদ্বানগণের মতভেদে, ৩। অলঙ্কার বিদ্যায় এবং ৪। ফিক্‌হ শাস্ত্রে। তিনি আরও বলিয়াছেন,

إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الامة دينها -

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস- "আল্লাহ প্রত্যেক শতাব্দীর গোঁড়ায় এমন ব্যক্তি প্রেরণ করিবেন যিনি এই উম্মতের জন্য তাহাদের ধর্মের বিপর্যস্ত অংশের সংস্কার সাধন করিবেন।" এই হাদীস সূত্রে প্রথম শতকের মুজাদ্দিদ হইতেছেন তাবেয়ী কুলাগ্রগণ্য আমীরুল মুমেনীন উমর বিনে আব্দুল আযীয (৬১-১০১) আর দ্বিতীয় শতকের মুজাদ্দিদ হইতেছেন ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্‌রীস শাফেয়ী।[২৩]

ভূবন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খল্লকান (৬০৮-৬৮১) তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, শাফেয়ী বহু গুণসম্পন্ন, বহু গৌরবের অধিকারী, আপন যুগের অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় মহান বিদ্বান ছিলেন। কুরআনের পাণ্ডিত্য, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নতের প্রজ্ঞা, সাহাবাগণের সিদ্ধান্তের অভিজ্ঞতা, বিদ্বানগণের- মতভেদ সম্বন্ধে দক্ষতা, আরবদের ভাষা, অভিধান, সাহিত্য ও কবিতায় গভীর জ্ঞান তাঁহার বিদ্যার সাগরে সঙ্গম লাভ করিয়াছিল।[২৪]

হুবহু এই ভাষাতেই ইমাম আবু মুহাম্মদ ইয়াফেয়ী (-৭৬২) তাঁহার ইতিহাসেও শাফেয়ীর গুণ গাহিয়াছেন।[২৫]

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্‌রীস আবু হাতিম রাযী (১৯৫-২৭৭) বলিয়াছেন, যে, যদি শাফেয়ী না হইতেন তাহা হইলে আহ্‌লে হাদীসদিগকে অন্ধ হইয়া থাকিতে হইত।[২৬]

[22] ইয়াফেয়ী ঃ মিরআতুল জেনান, [২] ১৭ পৃঃ।
[23] ইয়াফেয়ী ঃ মিরআতুল জেনান, [২] ১৭ পৃঃ।
[24] ইবনে খল্লকান, [২] ৪৪৭ পৃঃ।
[25] মিরআতুল জেনান, [২] ১৬ পৃঃ।
[26] মিরআতুল জেনান, [২] ১৯ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবারবর্গের প্রতি অকৃত্রিম ও গভীর শ্রদ্ধার অপরাধে একদেশদর্শীর দল ইমাম শাফেয়ীকে রাফেযী, শিয়া প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন। এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া খলীফার আদেশে যখন তিনি ধৃত হন, তখন ইমাম শাফেয়ী তাঁহার স্বরচিত যে কবিতাটি পাঠ করিয়াছিলেন তাহা আমি নিম্নে উধৃত করিয়া দিতেছি।

يا را كب البيت قف بالمحصب من منى ،

واهتف لساكن خيفها و الناهض !

قف ثم ناد بانني لمحمد،

ووصيه و ابنيه لست بباغض!

ان كان رفضاحب ال محمد،

فليشهد الثقلان انى رافضى !

"হে মক্কার যাত্রী উষ্ট্র-পৃষ্ঠের সওয়ার! একবার মিনা প্রান্তরে কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানে কিছুক্ষণের জন্য থামিও আর খীফ ও তদঞ্চলের অধিবাসীদের ডাকিয়া বলিও! একটু দাঁড়াইও আর উচ্চকণ্ঠে বলিও-

আমি মুহাম্মাদের (সা) পক্ষে এবং তাঁহার ওসী এবং তদীয় দুই পুত্রের পক্ষে আমি বিদ্রোহী নই, যদি মুহাম্মদের (সা) পরিবার বর্গের প্রেম রাফেযী হইবার নিদর্শন হয় তাহা হইলে মানব দানব সকলেই সাক্ষী থাকুক যে, আমি রাফেযী?

জীবন সন্ধ্যা

ইমাম শাফেয়ী তাঁহার জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর মিসরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান গরীমার যশঃসৌরভে তাঁহার জীবদ্দশাতেই ইসলাম জগতের সকল প্রান্তে আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। হানাফী ও মালিকী বিদ্বানগণের ইমামগণ দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছিলেন। ১৯৫ হিজরী পর্যন্ত ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালিকের মযহব অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং মালিকী বিবেচিত হইতেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, ইসলাম জগতের কতিপয় অঞ্চলে ইমাম মালিকের পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং এই পূজা এরূপ উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে যে, কতক স্থানে ইমাম মালিকের উক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস অপেক্ষাও অগ্রগণ্য বিবেচিত হইতেছে, তখন ইমাম শাফেয়ী রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁহার অন্তরে

যে অনাবিল শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, তাহার বশবর্তী হইয়া রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের সমর্থন ও সাহায্য কল্পে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ইহারই ফলে তিনি অতঃপর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাফেয়ী মযহবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন।

ইমাম সাহেবের ছাত্র মণ্ডলী

যে সকল বিদ্যারথী ইমাম সাহেবের জ্ঞান পারাবার হইতে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ। মওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী হিদায়ার ভূমিকায় ইমাম সাহেবের অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র রুবাইঅ বিনে সুলায়মানের উক্তি উধৃত করিয়াছেন, যে, আমি একদা ইমাম সাহেবের গৃহ দ্বারে তাঁহার ছাত্র মণ্ডলীর সাত শতটি সওয়ারী দেখিতে পাইলাম। এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের সমুদয় ছাত্রের সংখ্যা যে কত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। যে সকল জ্যোতিষ্ক বিদ্যা ও গৌরবের আকাশে ইমাম শাফেয়ীর নাম লইয়া অনন্তকাল যাবৎ আলোক বিকীর্ণ করিতে থাকিবেন যদি শুধু তাঁহাদেরই নাম গণনা করা যায় তাহা হইলে আল্লামা ইবনে হজরের উক্তি মত তাঁহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৪। তাঁহাদের মধ্যে ১৪৯ জন এরূপ ছাত্র যাঁহারা এককালে স্বয়ং ইমাম শাফেয়ীর উসতায ছিলেন, অবশিষ্ট ১৫ জন তাঁহার সহযোগী। এই দলের মধ্য হইতে আমি মাত্র কয়েকটি বিশ্ব বিশ্রুত নাম নিম্নে উধৃত করিতেছি ঃ

১। ইমাম আবু বকর আবদুল্লাহ বিনে যুবায়দ আলহুমায়দী

হাদীস-শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম, ইমাম বুখারীর উস্তায। ইমাম ইবনে উআয়নার দলের নেতা, মক্কার মুফতী, ২১৯ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

২। ইমাম সুলায়মান বিনে দাউদ বিনে দাউদ আবুর্-রুবাইঅ

হাদীস সমূহের অন্যতম রাবী, ২৩৪ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

৩। ইমাম আহমদ বিনে হাম্বাল-মহমতি ইমাম- চতুষ্টয়ের অন্যতম। বিস্তৃত জীবনী পরে আলোচিত হইবে।

৪। ইমাম আবু সওর ইবরাহীম বিনে খালিদ কলবী-

স্বতন্ত্র মযহবের প্রতিষ্ঠাতা। আযরবাইজান ও আরমেনিয়ার অধিবাসী বৃন্দ তাঁহারই মযহব অনুসরণ করিয়া চলিতেন। সাধককুল চূড়ামণি হযরত জুনায়দ বাগদাদী তাঁহারই মযহবের অনুসারী ছিলেন। ২৪৬ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

৫। ইমাম হরমালা বিনে ইয়াহয়া আবু আবদুল্লাহ মিসরী

-হাফিযুল হাদীস, শাফেয়ী ফিক্‌হের মবসূত ও মুখতসর প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৬৬ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ২৪৩ হিজরীতে মিসরে পরলোকপ্রাপ্ত হন।

৬। ইমাম আবু মুহাম্মদ হাসান বিনে মুহাম্মদ,বিন আস্‌সব্বাহ যাআফ্‌রানী-বাগদাদী।

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম শাফেয়ীর বিশিষ্ট ছাত্র, বিখ্যাত ফকীহ, অভিধান শাস্ত্রে এবং বাগ্মীতায় আপন যুগে অতুলনীয়। ২৫৯ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

৭। আবু ইব্‌রাহীম ইসমাঈল বিনে ইয়াহয়া আলমুযনী-

ইমাম শাফেয়ীর বিশিষ্ট ছাত্র, মিসরের অধিবাসী। শাফেয়ী মযহবের অধিকাংশ গ্রন্থ- যথা ঃ জামে কবীর, জামে সগীর, মুখ্‌তসর, মনসূর, তরগীব প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৭৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ২৬৪ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

৮। ইমাম ইয়ূনুস বিনে আবদুল আ'লা আবু মুসা ইবনে ময়সরা সদফী-

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম, হাদীসশাস্ত্র-বিশারদ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। জন্ম ১৭০ হিজরী, মিসরে ২৬৪ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

৯। ইমাম মুহাম্মদ বিনে আবদুল হাকাম আবু আবদুল্লাহ মিসরী-

আপন যুগে মিসরে বিদ্যার মুকুটহীন নরপতি ছিলেন। পূর্বে ইমাম মালিকের মযহবের একনিষ্ঠ প্রচারকরূপে ইমাম শাফেয়ীর প্রতিবাদে "আররদেদ্দা আলাশ্‌শাফেয়ী" নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ২৬৮ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

১০। ইমাম আবু মুহাম্মদ রুবাইঅ বিনে সুলায়মান বিনে আবদুল জব্বার-আল মুরাদী

জন্ম ও মৃত্যু মিসরে ইমাম শাফেয়ীর গ্রন্থ সমূহের বর্ণনাদাতা। মিসরের ইবনে তুলুন বিশ্ব বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম হাদীস রেওয়ায়তকারী। ১৭৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ২৭০ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

১১। ইমাম আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিনে ইয়াহয়া-আল-কুরায়শী বুওয়ায়তী।

ইমাম শাফেয়ী ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, আমার ছাত্রগণের মধ্যে বুওয়ায়তী অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান আর কেহ নাই। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর পাঠন ও ফতওয়া ব্যাপারে তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। খলীফা ওয়াসেক বিল্লাহ্‌র সময় যুক্তিবাদী (মু'তাযিলা)-দের ষড়যন্ত্রে কারারুদ্ধ হন এবং আহলে সুন্নাতগণের সমর্থনের অপরাধে ২৩১ হিজরীতে কারাগারেই পরলোকগমন করেন।

ইমাম সাহেবের এই সকল ছাত্র কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহ সিহাহ সিত্তার গ্রন্থরাজি বিভূষিত রহিয়াছে। শুধু ইহারাই নহেন, ইমাম সাহেবের প্রায় সমুদয় ছাত্রই সিহাহ সিত্তার রাবী। এইরূপ ২৪ জনের নিকট হইতে বুখারী, সতের জনের নিকট হইতে মুসলিম, আঠার জনের নিকট হইতে আবু দাউদ, সাত জনের নিকট হইতে তিরমিযী, নয় জনের নিকট হইতে নাসায়ী, ছয় জনের নিকট হইতে ইবনে মাযা এবং ৮৩ জনের নিকট হইতে অন্যান্য ইমামগণ হাদীস রেওয়ায়ত করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

সূর্য্যাস্ত

কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, মিসরে ফিত্‌য়ান নামক মালিকী মযহবের অন্ধ মুকাল্লিদ একজন তর্কবাগীশ বাস করিতেন। তিনি আপন মজলিসে ইমাম শাফেয়ীর বিরুদ্ধে প্রায় অভদ্রোচিত ভাষায় আক্রমণ চালাইতেন। কোন এক তর্কযুদ্ধে তিনি ইমাম শাফেয়ীকে আঁটিয়া উঠিতে না পারায় কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করেন। ইমাম সাহেব তাঁহার গালাগালিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া মূল বক্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করিতে থাকেন। মিসরের শাসন কর্তৃপক্ষ সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তর্কবাগীশটিকে ধৃত করেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করাইবার শাস্তি দেন। এই ঘটনায় ফিত্‌য়ানের মূর্খ ভক্তের দল কুপিত হইয়া উঠে। আর কতিপয় গুণ্ডা ইমাম সাহেবের দর্সের হলকায় যোগদান করে, পঠন ও পাঠন সমাপ্তির পর যখন অন্যান্য ছাত্রমণ্ডলী বিদায় গ্রহণ করেন তখন আকস্মিক ভাবে গুণ্ডারদল ইমাম সাহেবকে আক্রমণ করিয়া এরূপ ভয়ঙ্কর ভাবে আঘাত করে যে, অবশেষে তাঁহাকে তাঁহার বাসগৃহ পর্যন্ত বহন করিয়া আনিতে হয়। এই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে ইমাম সাহেব মানবলীলা সংবরণ করেন। কিন্তু রিজাল ও জীবনী সমূহের বিশ্বস্ত

লেখকগণ এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, ইমাম সাহেব স্মৃতিশক্তি বর্ধনের জন্য ছাত্র জীবনে অধিক মাত্রায় লোবান ব্যবহার করায় অবশেষে তিনি অর্শরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং এই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে অধিক মাত্রায় রক্তক্ষয় ঘটিয়া তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এরূপ কথাও লিখিয়াছেন যে, হাদীস বিদ্বেষীগণ তাঁহাকে বিষপান করাইয়াছিল। ফলকথা, কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, অসূল, ইতিহাস, আরবী সাহিত্য প্রভৃতি বিদ্যার একচ্ছত্র অধিপতি, জ্ঞান ও প্রতিভার এই উজ্জ্বল ভাস্কর ২০৪ হিজরীতে রজব মাসের শেষ রাত্রিতে চিরতরে অস্তমিত হইয়া যায় ... ইন্নাল্লিাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। রাহেমাহুল্লাহু ওয়া রাযিয়া আনহু।

সমাপ্ত